তারাপদ সিরিজ

পথের ধূলি

[redacted]ন্দ্রনাথ সরকার

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

মূল্য ৸৹ বার আনা

প্রকাশক—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার

১৯১-৩৯, ষ্ট্রীট্, রেঙ্গুন

প্রিন্টার-শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা


উপহার

দু'টী কথা

১৩২১ সালের ভারতবর্ষে পুনর্ম্মিলন গল্পটী সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩৩০ সাল হইতে ১৩৩৪ সালের মধ্যে অন্যান্য গল্পগুলি মানসী [illegible] আলো, বৌদ্ধবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত [illegible] কারে প্রকাশের সময় গল্পগুলির স্থানে স্থানে [illegible] করিয়াছি, ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি, [illegible] তকের উপর। লেখকের বক্তব্য এইখানেই

[illegible] নং [illegible] রোড,
১০ই চৈত্র ১৩৩৬ সাল।

দীনহীন
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পথের ধূলি

নিয়তি

১



…নের পরিচয়। কিন্তু এই ক'টা দিনের …ক'রে পে'য়ে বস্‌বে, তাত জানতামনা। …ার কুলুপ-কাঠি আর অমন ক'রে নিশ্চিন্ত …সেখানকার যত গোপন অন্ধি-সন্ধিও তাকে …সর্ব্বারক্ত হ'য়ে নিজেকেও আর এমন ভাবে …বালি আবর্জ্জনার মধ্যে এনে' ফেল্‌তামনা।

প্রকাণ্ড গানের বৈঠক বসেছে। চুড়িদার অস্তিনওয়ালা পাঞ্জাবী গায়ে হিন্দুস্থানী কালোয়াৎ, তবলচী, সারেংওয়ালা কিছুরই অভাব নেই। মোটের উপর আসরটী বেশ জমজমে হ'য়ে উঠেছে। এমন সময় রক্ত চক্ষু গুটীদুই বাবুর সঙ্গে চস্‌মা চোখে, ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা চেহারার এক ব্যক্তি এ'সে উপস্থিত। তাকে দেখে'ই অনেকে একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, আরে এই যে হেমবাবু! আসুন—আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌!

গানের আসরে যখন এত সমাদর, তখন বুঝ্‌তে আর বাকী রইলনা,

যে এ লোকটীও একজন গায়ক। তখন নিজের ওপর একটুখানি নিজেরই ঘৃণা জ'ন্মে গিয়ে এই কথাটাই বার বার মনের মধ্যে জাগ্‌তে লাগ্‌ল আজকের দিনে বলা যে'তে পারে, এদেরই মনুষ্য জন্মগ্রহণ সার্থক।

এতক্ষণ ধ'রে কেবল সপ্তসুরের মল্লযুদ্ধ চল্‌ছিল। সেই একঘেয়ে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নির তাল ঠোকাঠুকিতে গন্ধর্ব্ব লোকবাসিগণ হয়ত পরম পরিতৃপ্ত হচ্ছিলেন,—কিন্তু আমাদের মতন নবলোকবাসিদের প্রাণ নিতান্তই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এবাবে এই নবাগন্তকের আবির্ভাবে সত্য কথা বল্‌তে কি অনেকেই যেন একটু স্বস্তির হাঁফ্ ছে'ড়ে বাঁচ্‌ল। বেশী অনুবোধের প্রয়োজন হ'লনা। দু-একজন ভদ্রলোক একটু বল্‌তেই হেম গান ধবলে "মন্দ মন্দ বহত পবন।" চমৎকার গান! গানটী ত্রিপুরার মহাবাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের। যাক্, এবারে [illegible] 'মিঠে'র আস্বাদ পে'য়ে অনেকেই যে বেশ পরিতৃপ্ত [illegible] বলাই বাহুল্য।

এবারে গায়িয়ের আর রক্ষা নাই। কেবল [illegible] ফরমাস চল্‌তে লাগ্‌ল। কেউ বল্‌লে হ্যাঁ মশাই! এবার 'আমার দেশটী হোক্ না!' সঙ্গে সঙ্গেই অমনি আরেক'জন বলে বস্‌ল, মশাই! আমার জন্মভূমিটীও যেন বাদ যায়না দেখ্‌বেন। পাল্‌টা অপর এক ব্যক্তি একটুখানি মিনতিব সুরে ব'লে উঠ্‌ল। "গরীবের একটা সামান্য আবেদন ছিল,—"

কি—কি বল্‌তে চান, বলুন?—বলতেই সে লোকটী ব'লে বসল, "বেশী কিছু তেমন নয়। রবি ঠাকুরের সেই 'হেথা আমি কি গাহিব গান'টা যদি দয়া ক'বে এই সঙ্গে হ'য়ে যেত ত বোধ হয় মন্দ হ'ত না।' ল্যাঠা চুকে যে'ত।"

লোকটা একটু রগুড়ে। তার যোড়হাত ক'রে দাঁড়াবার ভঙ্গীতে বিশেষতঃ কথা বলার ধরণ দে'খে অনেকেই হো হো শব্দে হে'সে উ'ঠে

বল্‌লে, "হাঁ হাঁ এক সঙ্গেই হবে মশাই! সেজন্যে আপনার কোন ভাবনা নেই।" লোকটী লজ্জা পে'য়ে মাথা হেট ক'রে অমনি ব'সে পড়্‌ল।

রকম সকম দে'খে হিন্দুস্থানী ওস্তাদজীরা ত অবাক্! তাঁরা একেবারে হাত গুটিয়ে ব'সে রইলেন। আর মনে মনে বোধহয় এই ব'লে আপ্‌শোষ কর্ত্তে লাগ্‌লেন যে হিন্দুস্থানের খাঁটী রাগ-রাগিণী বাংলার মাটীতে এ'সেই মাটী হ'য়ে গেছে।

হেম সকলের দিকেই তাকিয়ে তখন স্নিগ্ধ হাস্যে বল্‌লে, "এই সব বড় বড় জহুরীর কাছে কি আর ঝুঁটো চল্‌বে। তবু শক্তিতে যতটুকু কুলোয়,তার ক্রটী হবে না"—ব'লেই হারমোনিয়াম্ বেলো ক'রে গান ধ'রে দিল। বল্‌তে কি, প্রত্যেকখানা গানই এমন মধুর সুকণ্ঠে, সুন্দর সুরে লয়ে গে'য়ে সে শেষ কর্‌লে, যে উপস্থিত কেউই আর বাহবা না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। অমনি [illegible] সে'ধে গি'য়ে আলাপ করবার ইচ্ছা হ'ল। অল্পক্ষণের [illegible] গেল, যার সঙ্গে আলাপ হ'ল, তার ভিতরটা না জানি কত সুন্দর! বল্‌তে কি, লোকটীর ওপর কেমন একটু মমতা জ'ন্মে গেল। একটুখানি যেমনি বলেছি, মাঝে মাঝে এইরূপ এক আধবার আমাদের কথা মনে পড়ে ত দয়া ক'রে এদিকে পায়ের ধূলো দেবেন—অমনি সে কর্‌লে কি, আমার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, সর্ব্বনাশ! আমাকে অমন ক'রে অনুরোধ করলে যে লজ্জায় আমার আর মাথা তোল্‌বারও জো থাক্‌বেনা। "আচ্ছা আজকের মতন আসি এখন—নমস্কার" ব'লেই সাইকেলে চ'ড়ে বস্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘণ্টা বাজিয়ে চোখের নিমেষেই সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

দু-চার মাস যায়। বিরাট সাহিত্য সভার আয়োজন চল্‌ছে। নতুন গান সভার জন্যে বেঁ'ধে গাইতে হবে। বাঁধনদারেরা গান বেঁ'ধে দিলেন। হেম সুর দিল—চমৎকার সুর! কোরাসে নিজে হারমোনিয়াম বা'জিয়ে

যখন সে দলের সঙ্গে সঙ্গে গাইলে, কেউই তখন তাকে ধন্য ধন্য সুখ্যাতি না করে পারলেনা। অনুসন্ধানে জান্‌তে পারলাম, হেম বাস্তবিকই বড় ভালমানুষ। সেদিনের সেই রক্ত চক্ষুদের সঙ্গে তার কোনই পরিচয় নাই। আমাদেরই মত সেও তাদের খবর কিছুই জানেনা। এবারে লোকটীর ওপর জানিনা কেন ভারী একটা শ্রদ্ধা জন্মে গেল।

দিন যায় – হেমও মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে গানের বৈঠকে আসে, গান গায়, চ'লে যায়, যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কেমন একটুখানি নাড়া দি'য়ে যায়, সারা বুকটা যেন তাইতেই কেবল দোল খে'তে থাকে।

২

হঠাৎ পূরো একমাসের ওপর সে নিরুদ্দেশ। খোঁজ করে জান্‌তে পারা গেল সে River Surveyor হয়েছে। সহর থেকে ৩।৪ মাইল দূরে একটা জায়গায় সে সম্প্রতি বদলী হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা—আমাদের ক্লাবের সামনে, একগাল হাসি হেসে প্রাণ খুলে আধ-ঘণ্টাটাক্ ধরে সুখ দুঃখের কত কথাই যে বেচারী বল্‌লে, তা আজও পর্য্যন্ত আমার বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে। তার একটা কথায় আমার প্রাণটা ধড়ফড়িয়ে উঠ্‌ল। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কেমন কথা! তুমি সাঁতার জাননা? বলাত যায়না—জলের চাকুরী ভাই! ঈশ্বর না করুন, যদিই কখনও সাঁতারের দরকার হয়? বলতেই "ভগবান্ ভরসা!" বলে সে উপর দিকে দু-হাত তুলে উদ্দেশে সর্ব্বনিয়ন্তাকে প্রণাম করলে। সেদিন

সেই সন্ধ্যার সান্দ্র্য-অন্ধকারে সে যখন বিদায় নিল, তখন তার মুখে যে নৈরাশ্যের ছায়া দেখেছিলাম, তা যেন আজও আমার চোখের ওপর ভাসছে।



একদিন বন্ধুবান্ধবদের মুখে বল্‌তে শুনলাম যে হেমবাবু জলে ডুবতে ডুব্‌তে বেঁচে গেছেন। Life belt দেবার প্রস্তাব চল্‌ছে। যাক্ বেচারী যে এবার প্রাণে বেঁচেছে সেই যথেষ্ট। জীবনে হেম অনেকগুলি গুণেরই অধিকারী ছিল। মা সরস্বতীর তার ওপর যথেষ্ট দয়া ছিল। তা ছাড়া কি চিত্র বিদ্যা, কি চিকিৎসা বিদ্যা, কোনটাই তার কাছে গোপন ছিলনা। পরোপকারের চেয়ে ধর্ম্ম নাই। এই পরোপকার স্পৃহা ছিল তার মজ্জাগত। মাহিনের অর্দ্ধেক সে দীনদুঃখীর সাহায্যে অকাতরে দান করত। এত গুণের অধিকারী হয়েও বেচারী জান্‌তনা সাঁতার। একেই বলে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান। একদিন সে নাকি কথায় কথায় বলেছিল "আমার জলে চাকুরী, তাতে আবার জানিনে সাঁতার! এবার আর আমার বাঁচা নেই।"

ওঃ! কি দারুণ ভবিষ্যদ্বাণীই সে ক'রেছিল। বরুণ দেবতার বুঝি বড়ই সাধ হয়েছিল, তার অমর কণ্ঠের সঙ্গীত শুন্‌বার। তাই বুঝি আজ প্রত্যুষেই শত শত কল্লোল-ধ্বনিতে তাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন ওরে আয় আয় আয়! ঘর ছেড়ে ছুটে চলে আয় আমার বুকের মাঝে।

মাথার উপর যে দেবতার ভরসায় সে বুক বেঁধে বসেছিল, তিনি যেন আজ আর তাকে বাধা দিতে পারলেন না। বেলা আটটায় নৌকা ছাড়ল।

অন্যান্য যাত্রিগণের সঙ্গে সেও দুস্তর দরিয়ায় নৌকারোহণে যাত্রা করলে। সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা হয়েছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা দম্‌কা বাতাস উঠে এল। অমনি চোখের পলক পড়তে না পড়তে নৌকা উল্টে গেল। তীর থেকে একটা সোরগোল শোনা গেল, গেল গেল, সর্ব্বনাশ হ'ল। আধ ঘণ্টা পরে সকলেই তীরে ফিরে এল। এলনা কেবল হেম।

আজ জলদেবতার কাছে স্বর্গের দেবতার পরাজয় হয়েছে। থাক দেখি ক্ষণকাল চুপ ক'রে ওই নদীসৈকতে কাণ পেতে! কি শোনা যায় ওই কল্লোল তানের ভিতর থেকে! ওগো কথা বলে এখানকার শান্তি নষ্ট কোরোনা!...ওই যে ভেসে আস্‌ছে মৃদুমন্দ পবনে সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত লহরী—"মন্দ মন্দ বহত পবন।"

কবির দান

১

সে যে কেরাণী হবে, সে কথাটা বোধ হয়, বিধাতাপুরুষ তার ললাটে বেশ স্পষ্টাক্ষরেই লিখে রে'খেছিলেন ; কিন্তু সে যে কবি হবে, সে কথাটাও বোধ হয় ওই ললাটেরই একপাশে একটুখানি লেখা ছিল। তাই ইস্কুলের ভাল ছেলে হ'য়েও যখন সে শেষ পরীক্ষায় পাশ হতে পারলে না, তখন দেখা গেল যে, এর একমাত্র কারণই হচ্ছে তার অক্লান্ত কাব্য-চর্চ্চা। এর ভাবী ফলটা যাই হোক্, আশু ফলটা হচ্ছে মা-বাপের বকুনী হজম করা। তাই বা কেন? তার চেয়েতে বরং পয়সা রোজগারের ফিকিরে বিদেশে বেরিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কথাটা মনে হ'তেই কাউকে কিছুটি না ব'লে এক দিন টুক্ ক'রে সে বিদেশে বেরিয়ে পড়ল।

২

তিন বছর কে'টে গেছে। যাঁদের বকুনীর ভয়ে সে দেশছাড়া হয়েছিল, তাঁরা দু'জনেই এখন স্বর্গে। এখন তার একমাত্র অবলম্বন চাকুরী,—ভালও লাগে না,—ছাড়তে গেলেও পেট চলে না। তাই কোনও মতে বাঁধা কাজটুকু উৎরে দ্যায়।

জনহীন সমুদ্রের উপকূলে তার ছোট্ট আফিস ঘরটী। সেখানে সে একামাত্র কেরাণী। সাম্‌নে যতদূর দেখা যায়, কেবল জল, আর জল! সূর্য্যের কিরণে ঢেউগুলো ঝিলমিল করে ওঠে, বাতাসের সঙ্গে খেলা করতে করতে এসে বেলাভূমে হুম্ হাম্ শব্দে লুটিয়ে পড়তে থাকে,—আর সে এক দৃষ্টে মুগ্ধ হ'য়ে তার পানে তাকিয়ে থাকে।—তার হাতের কাগজ হাতেই থে'কে যায়, একটা কালির আঁচড়ও তার গায়ে পড়ে না। কখন হয়ত অন্যমনস্কভাবে কি লি'খে ফেলে। পড়ে দেখে সুন্দর কবিতা! কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! এ যে আফিসের খাতা!—আজই যে চাকুরী যাবে!

এইরূপেই দিগন্ত ঘেরা আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানেই তার কবিত্ব পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল।

একদিন কি একটা দরকারী কাজে একজন পুরানো বন্ধু তার আফিসে এসে উপস্থিত। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বন্ধু বল্লে, 'মাসিক কাগজে যদি কবিতা লেখ ত খুব ভাল হয়,—নামও হয়, এছাড়া ভবিষ্যতে আরও কিছু হ'তে পারে।' বলেই বন্ধু একটুখানি ফিক্ ক'রে হে'সে ফেল্‌লে।

তাতে সেও হে'সে বল্লে, "আর নামে কাজ নেই ভাই! অমনিই বেশ আছি। নামে মানুষকে ভারী অহঙ্কারী ক'রে তোলে। তার পর ভবিষ্যতের কথাও যা বল্লে, ওটাতেও আমার দরকার নেই। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করেই—আরও আমরা মাটী হ'য়ে গেলাম। আপাততঃ চাকুরী ক'রে যা মাসে মাইনে পাচ্ছি, এইতেই আমার ঢের কিন্তু পুষিয়ে যাচ্ছে। নিজের খরচ যাচ্ছে ১৫৲, দীন দুঃখীকে দিচ্ছি মাসে ৫৲ আর ১০৲ ক'রে ফি মাসে জমাচ্ছি নিদানের সম্বল। আমার ভাই, এর চেয়েক্তে আর বেশী কিছুর আবশ্যক নেই।"

বন্ধু সে কথায় বল্লে 'দেশের লোকের ত উপকার হতে পারে!'

ছাই উপকার হবে! আমার লেখা কেউ পড়ে দেখেছে কোনো কালে যে তাতে কোন উপকার হবে তুমি বল্‌ছ?'

বন্ধু তখন বিনীত স্বরে বল্‌লে 'ইস্কুল ছাড়বার পর আর তোমার কবিতা পড়বার আমার তেমন সুযোগ হ'ল কই?'

'সুযোগ না হয়েছে, তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। আমার কবিতা বাজারেও বিকোবে না, তাতে মানুষের কোন কাজও হবে না। কেবল তোমার মতন দু'চার জন বন্ধু বান্ধবেরই অর্থাৎ যারা আমাকে ভালবাসে, তাদেরই হয়ত একটুখানি আনন্দ দান করতে পারবে।

'তা'হলেই হ'ল! ব্যস্! এখন দেখি একবার 'খাতাখানা!'

'তুমি দেখ্‌ছি, নেহাৎ আমার সাধনার জিনিসটাকে বাজারের জিনিস করে তুলবে?'

'তা যদি তুলিইত উপায় নেই' বলেই সে একরূপ জোর ক'রেই বন্ধুর কাগজ পত্র ঘাঁটকাতে লাগল। বেশী খুঁজ্‌তে হ'ল না। দু'চার মিনিটের মধ্যেই আফিসের একখানা মোটা খাতা বের হ'য়ে পড়ল।

দু'চার পংক্তি প'ড়েই সে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বলে উঠ্‌লো—'বেরে—চমৎকার! এই'ত হ'ল বর্ত্তমান যুগের কবিতা! এই কবিতা লিখ্‌বে বলেই কি এই নির্জ্জন সমুদ্রতীরে এসে নির্ব্বাসন ভোগ কচ্ছ?—'

বন্ধুর কথায় সে একটুখানি হে'সেই বল্‌লে 'কতকটা সত্যি ভাই। মানুষের জীবন সংসারের নানা রকম আঁট-ঘাটে বাঁধা প'ড়ে থাকে,—তা স্বাধীন চিন্তা করবে কখন?'

বন্ধুটি বল্‌লে, 'আর অনবরত ভয়, মানুষের না যত, টিকটিকির ভয় তার চেয়েও ঢের বেশী। এখানে ওসব বালাই নাই—বোধ হয়।'

'না! যারা আমাকে জানে, একরূপ নিরক্ষর মূর্খ ব'লেই জানে।

কেবল 'মালের' ছাপানো চালান লেখা পর্য্যন্তই আমার বিদ্যে,—এইটেই সাধারণ লোকের ধারণা। এটা ভাল নয় কি?'

'নিশ্চয়ই ভাল।'

'তাইত ভাই, জীবনের সাধনাটাকে কতকটা সফল কর্ত্তে পেরেছি।'

'পারবে, আরও পারবে! প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশের তলে, উন্মুক্ত সাগরের তীরে বসে' ওই আকাশেরই মত বিশাল উদার প্রাণ দিয়ে, ওই সমুদ্রেরই কলগর্জ্জনের মত যে গান তুমি গেয়েছ, সে কি ফেল্‌বার মত জিনিস ভাই! দাও আমাকে তোমার এই খাতাখানা ভিক্ষা! একমাস পরে আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দেবো।'

সে কথায় সে একটুখানি হেসে বল্লে, 'খাতাও দেবো, ফিরিয়েও দেবে, সবই সত্যি,—কিন্তু দেখো ভাই চাকুরীটি যেন না খোয়াই।'

'আরে রামচন্দ্র'! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো তুমি' ব'লেই বন্ধু খাতা নিয়ে প্রস্থান করলে। সে একদৃষ্টে তার পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের মনে মনে ব'লে উঠ্‌লো 'বন্ধুর' দরদ বন্ধুই বোঝে।' বলেই আফিসের খাতায় 'ঠিক' নামাতে লাগ্‌লো।



একপক্ষও কাটে নাই। দেখা গেল দলে দলে ফেরিওয়ালা ডাক হাঁক ক'রে সাপ্তাহিক মাসিক নানারকম খবরের কাগজ বিলি করতে বের হয়েছে। এদিক্‌টায় জনপ্রাণীর সাড়াশব্দের মধ্যে কেবল হটর হটর শব্দে ২।৪ খানা গরুর গাড়ীর আনাগোনা,—আর কখন সৌখীন বাবুদের শুভাগমন,—তাও এক প্রকার কালে ভদ্রে, সুতরাং জায়গাটা বেশ নির্জ্জন।

হঠাৎ একটা হাঁক শু'নেই কবি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। শেষে যখন সে দেখ্‌তে পেল, যে তারি রচিত জাতীয় সঙ্গীত আবৃত্তি কর্‌তে কর্‌তে জন দুয়েক ফেরিওয়ালা তার দিকে আস্‌ছে, তখন সে কৌতূহল দমন করতে না পেরে একেবারে আফিস ছেড়ে বাইরে এসে পড়ল। তাকে দে'খেই একজন চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো' দেখুন মশাই এবারকার 'বিজয়িনী' পত্রিকা প'ড়ে। কিনে পড়ুন এর এক কাপি ;—কেমন শরীরের রক্ত নে'চে উঠ্‌চে দেখ্‌বেন।

'পয়সা'—কোথায় যে কিন্‌বো ?' ব'লেই সে মুখখানা একটু গম্ভীর ক'রে ফিরিয়ে নিলে।

ফেরিওয়ালাও কম পাত্র নয়,—অমনি ব'লে ফেল্‌লে, 'নিন্ মশাই। কত পয়সা কত দিকে বাজে খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। না হয় আটগণ্ডা পয়সা বাজে খরচই করলেন।'

তার এই তীব্র বাক্যে মনে মনে খুসী হ'য়ে সে পকেট থেকে একটী আধুলী বের ক'রে তার হাতে দিয়ে একখানি কাগজ কিনে নিলে।

প্রথম পাতা খুল্‌তেই চোখে পড়ল, তার 'জন্মভূমি' কবিতা। তার এই চিরজন্মের সাধনার কবিতা-লক্ষ্মী কোথায় এতদিন কোন্ ধূলি-মলিন জীর্ণ পুঁথি-পত্রের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল—তার আজ এত আদর! ছাপার অক্ষরের পোষাকে রাজরাণী সেজে' সে যে আজ জগতের সাম্‌নে সগর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করেছে বুকের ভেতরটা তার কেমন তোলপাড় ক'রে উঠ্‌তে লাগল। কিন্তু বহুকষ্টে আত্ম-সংবরণ ক'রে সে আবার কাজ-কর্ম্মের মধ্যে ডুবে' গেল।

৪

দেখতে দেখ্‌তে বছর ঘুরে গেল। কবিরা অমর হলেও পঞ্চভূতের দেনা তাদেরও শোধ কর্‌তে হয়। এই অজ্ঞাত অখ্যাত কবি একদিন হঠাৎ প্লেগে মারা গেল। সংবাদটা কেউই তেমন জান্‌তে পার্‌লে না। বন্ধুটী তখন বিদেশে। যারা তাকে চিন্‌ত, তারা সব্বাই বলাবলি কর্‌তে লাগল, "আহা কেরাণী বেচারী বেরে লোকটী ছিল গা।" কেউবা বিজ্ঞের মতন ব'লে বস্‌ল—"ম'রে গেছে না বেঁচে গেছে। সাত জন্ম মানুষ না হওয়াও ভাল ত, কেরাণী হওয়া কোন কাজের নয়!" ইত্যাদি নানারূপ সমীচীন মতামত প্রকাশ ক'রে যে যার কর্ত্তব্য শেষ করতে কুণ্ঠিত হ'লনা।

যে বেচারী জীবিত থাকৃতে কোনদিন কবি ব'লে সম্মান পাওয়া দূরের কথা, সামান্য একটা মানুষ ব'লেও কারও কাছে এতটুকু সহানুভূতি পায়নি, সে যে আজ পরলোকের যাত্রাপথে চির-অবজ্ঞাত কেরাণী হ'য়েও পাঁচজনের তাচ্ছিল্যের দেওয়া একটুখানি ব্যথার বাণীকে পাথের সম্বল ক'রে যেতে পারলে, এইটেই তার আত্মার পক্ষে আপাততঃ পরম লাভ।



পাঁচ ছয় দিন পরে একদিন আফিসের বড়বাবু জন কয়েক দ্বারোয়ান সঙ্গে নি'য়ে এই ক্ষুদ্র আফিস ঘরের কাগজপত্রগুলো তদারক ক'র্‌তে এলেন। উদ্দেশ্য, প্লেগের বিষ ধ্বংস করবার জন্য কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা। হুকুম মাফিক কাজ সুরু হ'ল। হঠাৎ একখানা ভারী মোটা খাতার উপর নজর পড়্‌তেই তাঁর চোখে পড়্‌ল মলাটের ওপর বড় বড়

অক্ষরে লেখা 'দেশের গান', তার নীচেই এই সন্ত-মৃত কবির নাম। দু' একপাতা ওল্‌টাতেই তিনি মুখখানা কেমন বিশ্রী ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন 'আফিসের বইয়ে পদ্য লেখা হয়েছিল! ভাগ্যিস্ ম'রে গেছে, নইলে জেলে যেত। লাও দ্বারোয়ান, ইস্কোভি আগিমে ডালো।'

মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল। দেখা গেল, দূর থে'কে একটা লোক দু'হাত উঁচু ক'রে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। লোকটা মৃত কবির বন্ধু। কাছে এ'সেই মুহূর্ত্তকাল সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল; পরে আগুনের কাছটায় ছুটে গিয়ে যখন দেখ্‌তে পেল, যে সেই মোটা বইখানা দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে, তখন তাকে ফেরায় কার সাধ্য! 'গেল গেল! সর্ব্বনাশ হ'ল'—বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সে একেবারে সেই জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে গেল,—কিন্তু পার্‌লে না! বড়বাবুর হুকুমে তৎক্ষণাৎ লোকজন এ'সে তাকে পাকড়াও ক'রে ফেল্‌লে। সকলেই তার এই কাণ্ড দে'খে বিস্মিত অবাক্! নিতান্ত নিরুপায় সে তখন,—কি আর কর্‌বে? পাগলের ন্যায় বিকট হাস্যে সমুদ্রতট আলোড়িত ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল; 'একটা সমগ্র জাতির জীবনে যা অবিনশ্বর হ'য়ে রয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে তার কি ধ্বংস করবে বলত? বিশ্বাস না হয় 'মাসিক' গুলোর পাতা উল্‌টিয়ে দেখো একবার। রাস্তায় পথে ঘাটে চল্‌তে চল্‌তে একটুখানি কাণ পেতে থেকো! দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, কি রয়েছে তার ভেতরে। রয়েছে তোমারি এই গরীব কেরাণীর দুঃখ দৈন্য-ঘেরা মহৎপ্রাণের একমাত্র সঙ্গীত!'

'বটে!' ব'লে বড় বাবু হতভম্বের মত সেই বিস্ময়-বিমূঢ় জনতার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

পারের কড়ি

১

ভাঙন ধরা—বিজন নদীরকূলে তাদের বাড়ী। ঝড় তুফানের ক'টা মাস এখানে আর নিরাপদে থাক্‌বার জো নাই। তবুও বাধ্য হ'য়েই তাদের থাক্‌তে হয়। কেন না এই নদীতেই খেয়া পার ক'রে যা কড়ি জোটে তাতেই তাদের সংসার একরূপ চ'লে যায়।

সংসারটীও খুবই ছোট্ট। পরিবারে দু'টী মাত্র প্রাণী, বুড়ো মা ও ছেলে। অনেকগুলি সন্তান হারিয়ে যাওয়ার পর এই শেষ সন্তানটী নিয়ে মা বেচারী যখন বিধবা হয়, সেও কম পক্ষে পনর ষোল বছরের কথা। অধরের বয়স তখন চার বৎসর। এই চার বছরের একমাত্র সম্বলকে বুকের মধ্যে ক'রে বিধবা ক্রমশঃ পতি-পুত্রের শোক ভুল্‌তে লাগ্‌ল। সামান্য যা কিছু জমি-জমা ছিল, তার বেশীর ভাগই গৌরীর গর্ভে। যে দু' এক বিঘা তার গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তাও পাড়ার নমঃশূদ্র চাষীদের কাছে অনেকদিন থেকেই বিলি বন্দোবস্ত করে দেওয়া আছে। তারা যে সময় যে ফসলটী জন্মায়, তা থেকে হিসাব মত এদের ভাগটী এদের দিয়ে যায়। বিধবাকে ও তার ছেলেটিকে তারা ঠকায় না। তবে এতে সংসার চলে না। প্রধান উপজীবিকাই হ'ল খেয়া পার করা।

২

কোন্ সকাল বেলা হয় দু'টী পান্তা, নয় দু'টী গরম ভাত কোনও রূপে মুখে গুঁজে দিয়ে অধর খেয়া পার কর্‌তে চলে যায়। আর মা বেচারী সকাল সকাল রান্না-বান্না সে'রে ঘরের দাওয়ায় ব'সে ব'সে হয় ছেঁচা পান ও দোক্তার ধ্বংস কর্‌তে থাকে,—নয় আপন মনে গুন্ গুন্ ক'রে রাম প্রসাদী গান কর্‌তে থাকে ;—

"মা আমায় ঘোরাবি কত,
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।"

এইরূপ কর্‌তে কর্‌তে কোনো দিন হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে ; আর অমনি কাণে এসে বাজে—'মা ! ওমা !'

বুড়ী অমনি হম্‌কো-ধম্‌কো হয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে ব'সে জবাব দ্যায় "কই কখন ঘুমোলাম রে অধর ?"

'না ঘুমোস্ নি, আমিই মিথ্যে বল্‌ছি। নে এখন ওঠ্ ! আমাকে আবার এক্ষুনি যেতে হবে যে, সে কথা মনে আছে ?'

'আঃ ! খুব মনে আছে'—ব'লেই বুড়ী গায়ের আড়া মোড়া ভেঙ্গে অমনি উঠে পড়ে। হাটের দিন হ'লে বিশেষ ক'রে অনুযোগের স্বরে ছেলেকে ব'লে বসে,—'হ্যাঁরে অধর ! পোড়া হাটে কি ইলিশ মাছ ওঠে না রে ?'

'উঠবে না কেন ?—এইত সেদিনও ইলিশ মাছ নি'য়ে এলাম ! এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?' ব'লেই অধর হয়ত তাড়া দিয়ে বসে—'একটু শীগ্‌গির ক'রে !' পরে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে ব'লে ওঠে—'ওঃ !

তুই বুঝি খাস্‌নি মা !...হুঁ বুঝেছি। তা এত বেলা অবধি না খে'য়ে কেন শুকিয়ে মরিস্ বল্ তো ?...আমিত সকাল বেলা খে'য়েই যাই। নে, তোরও ভাতের থালা খানা নি'য়ে আয়। দু'জনে এক সঙ্গে খাই !' মায়েরও সাত নয়, পাঁচ নয়, একই অধর ; কাজেই তার আবদার না শু'নে পারে না। অগত্যা মায়ে ও ছেলেতে এক সঙ্গেই খে'তে ব'সে যায়। এইরূপ ক'রেই তাদের দিন কাটতে লাগল।



একদিন বুড়ী ছেলেকে বল্‌লে—'ত্যাখ্ অধর ওপাড়ার অনেকে এবার পশ্চিমে যাবে। আমারও একটা বার ইচ্ছে করে, ওদের সঙ্গে যাই। কিন্তু মাত্তর দু'কুড়ি টাকা তোর রোজগার থেকে এই দু' বছরে জমিয়েছি। এতে কি আর হয় ! নিদেন পক্ষে চার কুড়ি টাকার কমে হয় না।'

অধর বল্‌লে—'সত্যিই কি তুই আমায় ছে'ড়ে' যেতে পারবি ?'

'পারবো রে পারবো।' ব'লেই বুড়ী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। 'পারবি ত, অমন কর্লি কেন বল্‌তো ? হুঁ বড় পারিস্! গেল বারে একটা দিনের জন্যে তুই ভা'য়ের বাড়ী যেতে পারলিনে,—তা এবার তুই যাবি ! ছোট মামা তোকে কম সাধাসাধি করেছিল ! মনে আছে সে কথা ?...পারিস ত ভাল কথা। আমি নয়, আর দু-কুড়ি টাকা ধার ক'রে দিই তোকে।'

দেখা গেল, বুড়ী যে উৎসাহে কথাটা ছেলের কাছে পেড়ে ছিল, সে উৎসাহ আর তার নাই। তখন অধর হে'সে' ফেলে বললে,—'হুঁ তুই যাবি গয়া কাশী। এঃ—গেছিস্ দেখি ! তুই তীর্থ কর্‌তে গেলে তোর

অধরকে কে দেখ্‌বে বলতো?' ব'লেই হঠাৎ এক ঝলক হাল্‌কা হাসি হেসে বল্‌লে,—'আজকার ইলিশ মাছটা যা মিঠে, তা আর তোকে কি বলব? একবার খেলে বুঝ্‌তে পারবি?' ছেলের এত সব চটুল আব্‌দার উক্তিতে সত্যি সত্যিই বুড়ীর প্রাণের কোনখানটা যেন বেজে উঠ্‌ল। সে গয়া কাশী যাবার কথা মনের কোণেও আর স্থান দিল না। আরো বড় বড় দু'খানা মাছ হেঁসেল থেকে নি'য়ে এ'সে ছেলের পাতে তু'লে দিল। অধর আরো মাছ দেওয়া দেখেই বলে উঠ্‌লো—'করলি কি?—তোর জন্যে রাখ্‌লিনে?'

বুড়ী আঙ্গুল দিয়ে কড়াখানা দেখিয়ে বললে,—'এইত রয়েছে আমার জন্যে দেখ্‌চিস নে!'

অধর আর কোন জবাব না করে, খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল।

কিছুদিন বাদে অধর একদিন কথায় কথায় মাকে জিজ্ঞেস করলে,—"হ্যাঁ মা, তুই বলেছিলি যে চার কুড়ি টাকা হলে তোর গয়া কাশী যাওয়া হয়। আমি কিন্তু তোকে তার চেয়েও বেশী টাকা দিতে পারি।'

টাকার উল্লেখেই বুড়ীর চোখ দু'টী জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠ্‌লো। অমনি জিজ্ঞেস করলে—'ক কুড়ি জুটিয়েছিস্‌?'

'খুব বেশী না পাঁচ কুড়ি।'

অধরের জবাব শুনে বুড়ী তেমন খুসী হল না। বললে, 'ওঃ মোটে পাঁচ কুড়ি টাকা।—আমার যে আরও পাঁচ কুড়ি টাকার দরকার রে অধর।'

অধর কথাটা বুঝতে না পেরে মাকে প্রশ্ন করে বসল—'সেই না বলেছিলি যে তোর চার কুড়ি টাকাতেই গয়া কাশী ঘুরে আসা হবে। এখন বল্‌ছিস পাঁচ কুড়িতেও হবে না। তবে বুঝি মতলব করেছিস, আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতার থানই একবার দেখে আস্‌বি।'

বুড়ী হেসে ফেলে জবাব করলে—'যা বলেছিস।'

অধরও হেসে বল্‌লে—'তাত বুঝলাম। এখন তোর মতলবটা কি বল্‌ দেখি।'

'মতলব আবার তোকে কি বলব বল্‌। তুই আমাকে আর পাঁচ কুড়ি টাকা এনে দে,—তারপর আমার মতলব টের পাবি।'

'ওঃ!—তোর ত ভারী বদ মতলব দেখ্‌চি মা, তা হলে!'

বুড়ী ছেলের এ অনুযোগে চুপ করে হাস্‌তে লাগল।

৪

'কই পাঁচ কুড়ি টাকা দে দেখি আমাকে!' মা বলতেই অধর জবাব করলে,—'পাঁচ কুড়ি টাকা তোর কোথায় পাব যে দেবো বলতো! দু কুড়ি ত হাওলাতী টাকা, তা পাওনাদারকে দিয়ে ফেলেছি কোন্‌ দিন।'

বুড়ী যেন ধপাস্‌ করে আকাশ থেকে প'ড়ে গেল। 'বলিস্‌ কি, দু কুড়ি টাকা ছিল তোর হাওলাতী! আমি যে তাদের কথা দিয়ে ফেলেছি রে অধর!'

অধর হাস্‌তে হাস্‌তে মাকে বুঝিয়ে বল্‌লে—'নে, কথাই ত! তা দিয়েছিস,—দিয়েছিস—ফিরিয়ে আন্‌লেই হল।' ব'লেই আরো জোরে জোরে মাকে ক্ষ্যাপাবার উদ্দেশ্যেই হাস্‌তে লাগল।

'যাঃ! আবার হাস্‌ছিস কোন মুখে! আমার মরণ্‌, হলেও বাঁচতাম!' অধর তেমনি ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে বলে উঠল,—'ম'লে আর সত্যি সত্যিই বাঁচ্‌তিস নে মা। একবার ম'রেই ছাখ না।'

বুড়ী একটু রাগত ভাবে ব'লে উঠলো,—'যা, যা, আর দেক্ করিস্ নে বল্‌ছি। দে আমাকে দেখি, এই সামনের ছ মাসের মধ্যে দশ কুড়ি টাকা, তা হ'লে তোর কাছে আমি কক্ষনো কিছুই চাইব না।'

'টাকা দিয়ে সত্যিই কি কর্‌বি বল্‌তো ?' বল্‌তেই বুড়ী উত্তর করলে,—'কি আর করবো, আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম করবো। একটা বার পুরী গিয়ে বৈতরণীটে সেরে আস্‌বো। তারপর গয়া কাশী ক'রে ইচ্ছে হ'লে ফিরে এলাম, না হয় কাশীতে মা অন্নপুন্নো আছেন, তাঁর দোরে প'ড়ে রইলাম। যেখানে মার পেসাদ পেয়ে হাজার হাজার লোক বর্ত্তে যাচ্ছে, সেখানে আমার একার পেটের আবার ভাবনা রে অধর! এই সংসার সুমুদ্দুরে প'ড়ে কেবল হাবুডুবু খাওয়া বইত না! এবার দে আমাকে পারের কড়ি এনে, আমি স্বচ্ছন্দে এর মায়া কাটিয়ে চলে যাই।' বল্‌তে বল্‌তেই বুড়ী ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেল্‌লে। অধরও আর মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখের জল সহ্য করতে পার্‌লে না। তক্ষুনি একটা পান মুখে ফে'লে দি'য়ে তার দুপুরের খেয়া পারের কাজে চ'লে গেল।



দু মাস পরের কথা। বেশী উপার্জ্জনের আশায় অধর এ খেয়া ঘাটটী ভিন্ গাঁয়ের আরেকজনকে দি'য়ে একটু দূরের বড় ঘাটটী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এখানে গৌরী ও চন্দনা দুই সখীতে গলাগলি ধরে কারো পানে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আপন মনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে প্রেমাস্পদের সন্ধানে ছুটে চলেছে। এ পারে বহু কালের পুরানো নীল-কুঠি আর বিরাট

ঝাউবন, ওপারে বিখ্যাত দেবীগঞ্জের বাজার। এই ঘাটে একটা বার পাড়ি জমানো আধ ঘণ্টার কমে হয় না। এই ঘাটে বছরকার খাজনা ৬০০৲ টাকা। অধর দেখলে রোজ তিন চারটে করে টাকা রোজগার না হয়ে যাবে না। জমিদারের ন্যায্য খাজানা বাদে গড়ে যদি দেড়টা টাকাও রোজকার লাভ দাঁড়ায় ত মন্দ কি? পাঁচ ছ' মাসে বুড়ীকে সে নিজের রোজগার থেকেই অনায়াসে অমন দু'শত টাকা দিতে পারবে।

দুপুর বেলা অধরের আসা যাওয়া আহারাদিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা, পৌনে দু' ঘণ্টা কেটে যায়। এ সময়টায় দুপারে যাত্রীও জমা হয় বিস্তর। অধরের বুকটার ভেতর একটা ধুক্‌ধুকি থাকে, কখন খেয়া ঘাটে ফিরে যাবে।

এখনও বুড়ী আগের মতনই অধরকে কোন্ প্রত্যূষে দু'টী গরম ভাত খাইয়ে কাজে পাঠিয়ে দেয়; দিয়ে নিজেও সাবেক অভ্যাস মতই পান ও দোক্তার রসে কস্ রাঙ্গা করে ঘরের দাওয়ায় ব'সে ব'সে, পল পল ক'রে কেবল বেলায় হিসাব করতে থাকে। আর ঘাড় উঁচু ক'রে এক একবার তাকিয়ে দেখে, অধর আসছে কি না।

তার চোখ দু'টী প'ড়ে থাকে কেবল পথের ওপর, আর কাণ দু'টী থাকে যেদিক থেকে ঝাউ-বনের শন্‌শন্ শব্দ ভেসে আসতে থাকে সেই দিকে। 'ওই বুঝি আসছে,—না! এখনও দেরী আছে।' এমনি করতে করতে সময় সময় চোখের পাতা ভার হয়ে আসে,—হয় ত এমনি সময় তার অধর এসে উপস্থিত হয়।

বুড়ী একদিন একটুখানি গরম হ'য়ে বল্‌লে,—'তোর আস্‌তে এত বেলা যায় কেন রে অধর? আগেত এমনটা হত না।'

অধর উত্তর করলে,—'আগের ঘাট হল এই রশিটাক পথ, আর এখনকার বড় ঘাট যদি পাঁচ রশি পথও হয় ত কম বল্‌তে হবে। দেখ্‌তে পাচ্ছিস তো, ওই ঝাউয়ের বাদাল, ওই নীলকুঠি?'

'কাকে কি দেখাচ্ছিস রে! ঘাট কি ঠিক ওই খেনে?'

'তবে আর কোথায়?'

মা অমনি থপ্ করে ছেলের হাত খানা চে'পে ধ'রে বল্লে,—'ওঘাটে তোর কাজ নেইক অধর। আমাদের সাবেক ঘাটই ভাল।'

অধর হাস্তে হাস্তে মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—'বড় ঘাটে লাভ বেশী ব'লে মায় পেয়াদা পাইক থেকে সুরু ক'রে খোদ জমিদার বাবুকে পর্য্যন্ত নজর সেলামী দিয়ে এক বছরের জন্যে ঘাটটা বন্দোবস্ত ক'রে নিলাম। এইত সবে ছ' মাস হ'ল। এখনও ছ' মাস সাম্‌নে। এখন কেমন ক'রে ছে'ড়ে দিই, বলতো! ছাড়্‌তে গে'লে যে নিজেরই বিস্তর লোকসান।'

'তবু ছাড়তে হবে! কেন বল্‌ছি, সামনে বর্ষাকাল। দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না, এবার ঝড় তুফানের কত চোট্।'

'পাটনীর ছেলেকে কি ঝড় তুফানের ভয় কর্‌তে আছে রে বেটী?'

কথা শুন্‌ছিস্ নে অধর! কিন্তু এর ফল ভাল হবে ব'লে মনে হয় না।'

"যা তুই যতই বুড়ো হচ্ছিস্ মা! ততই তোর বুদ্ধি শুদ্দি লোপ পাচ্ছে। তোরই জন্যে, তোরই সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, কত কায়দায় ঘাটটা আটকালাম, এখন আবার বলিস্ ছাড়্‌তে। তা আমি কিছুতেই পারব না।'

'দিন দিন কি কাঠ গোঁয়ারই যে হচ্ছিস্ তা আর বলা যায় না। ওঘাটে ভূতের আবেশ আছে শুনেছি।

'যা—যত সব মিথ্যে কথা! এত কাল ত শুনিনি!'

'এতকাল কি আর আমিই জানতাম রে। সেদিন দুলেদের বড় বউ এ'সে ব'লে গেল ব'লেত জানতে পারলাম। ওই কুঠির কোন এক সাহেব বন্দুকের গুলিতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল! সেই নাকি ভূত হয়ে আছে

ওই কুঠিতে শোনা যায়, সময় অসময়ে সেই ঝড় তুফান ছিষ্টি ক'রে নৌকো টৌকোও ডুবিয়ে দেয়।'

অধর একটুখানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বুকের ছাতিটা ঠুকে বল্‌লে—'আচ্ছা, ভূতের গায়ে কতখানি জোর আছে, একবার এই অধর পাটনীর ডিঙ্গী যদি ডোবাতে পারে ত দেখা যাবে। দুনিয়ার যত সব আজগুবী খবর তোর কাছে! কোথা থেকেই যে জোটাস্ এসব খবর, তুই-ই জানিস্। বুড়ী ছেলের কথায় রাগ ক'রে ব'লে উঠলো,—'তোর কাছে ত আমার অত হিসাব নিকেশ দেবার দরকার পড়ে নাই রে অধর! যা ঘটে ব'লে দশজনে বলে, তাই তোকে বললাম। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কর্, না হয় না কর্।' বলেই বুড়ী রাগে গরগর কর্‌তে কর্‌তে সেখান থেকে চ'লে গেল।



তখন আষাঢ় মাস। ক'দিন ধ'রে কেবল অনবরত বৃষ্টি। সূর্য্য ঠাকুরের খোঁজ খবর নাই বল্‌লেই হয়। মাঝে মাঝে ঝড় তুফানও বিলক্ষণ উপদ্রব সুরু ক'রে দিয়েছে। ইতিমধ্যে দু একখানা জেলে ডিঙ্গী ও একখানা বোঝাই নৌকাও ঝড়ে ডু'বে গেছে।

অধর যে কি জন্যে ক'দিন ধ'রে কাজে একটুখানি ঢিল দিয়েছে, সে খবর বুড়ী জানে না। সে মনে করেছে, ছেলে বয়স, ঘাড়ে তেমন সংসারের চাপ এখনও পড়ে নাই,—তাই কাজকর্ম্মে গা না দি'য়ে অমন ঢিলিমিলি ক'রে বেড়ায়। বোধ হয়, দুলে পাড়ায় গিয়ে গ্যাঁজাটা

আশটাও টানে। নাঃ কিছুতেই ভাল লক্ষণ দেখচিনে। একবারটী আল্‌গা পে'লে একেবারেই মাটী হয়ে যাবে যে! এখন থেকেই একটুখানি শক্ত হবার দরকার। বল্‌তে বল্‌তেই বুড়ী একটুখানি কড়া স্বরে অধরকে ডেকে তুলে দিয়ে বল্‌লে, জমিদারের পাইকের কথা। অধর বিরক্ত হয়ে সে কথায় পাইকের উদ্দেশ্যে একটা অশ্রাব্য কটূক্তি ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—'তুইই মানা করেছিস্ আমাকে ওঘাটে খেয়া দিতে। এখন আবার তুইই উল্টো গাইছিস্ দেখি।'

বুড়ী ঝঙ্কার দিয়ে ব'লো উঠ্‌লো—'মানা করেছি ব'লে কি তোকে কুড়েমি কর্ত্তে বলেছি রে অধর? কুড়েমি কর্‌লে দু দুটো পেটের উপায়?'

'তোর উপায় তোর মা অন্নপূর্ণো,—আর আমার উপায় যা থাকে বরাতে—।' ব'লেই খিলখিল করে অধর হেসে উঠল।

'কেবল দাঁত বের ক'রে হাসি! আচ্ছা, মা অন্নপূর্ণোর কাছে গিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো! হবে ত? আপদ চু'কে যাবে ত? থাক্—থাক্—অততে আর কাজ নেই! এই মাসের মধ্যেই রথ-যাত্রা। যাবার যাত্রীও ঢের জুটবে এখন, দে আমাকে আমার বৈতরণী পারে যাবার কড়ি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা দেবো তোর যতখানের পারের কড়ি দরকার, এবার এনে! নইলে আর তোকে মুখ দেখাব না।' ব'লে অধর যেন আগুনের মত হ'য়ে উঠল।

* * * * *

মার শত অনুরোধও সে আজ কাণে তুল্‌লে না,—ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রেই সে বেরিয়ে পড়ল। মা যতই বলে—'এ তুফানের মধ্যে যাস্‌নে রে, যাস্‌নে!' সে ততই আরো জোর দিয়ে বলে,—'যাব না কি বলছিস? জমিদারের পেয়াদা এ'সে ডে'কে গেছে যে! না গেলে হয়ত এক্ষুনি ফিরে আস্‌বে।'

বুড়ী এবারে হুঙ্কার দি'য়ে ব'লে উঠ্‌লো,—'এলেই হল না! দেখিত, দেখি তার কেমন সাধ্যি, তোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।'

অধর মার রকম দেখে খল্‌খল্‌ করে হেসে উঠ্‌লো। আকাশে তখন প্রলয় দেবতার রণভেরী বেজে উঠেছে। তারই মধ্যে মার সেই নিষ্ফল তিরস্কাব ছেলেব সেই খল্‌খল্‌ হাসি মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল।

*   *   *   *   *

অনেকেই মানা কর্‌তে লাগল; কিন্তু কারো নিষেধ না শু'নে সেই তুমুল ঝড়ের মধ্যেই অধর নৌকা ছেড়ে দিল। যারা যারা পারে যাবার জন্যে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌লো, তারা সকলেই বল্‌তে লাগ্‌ল,—'সাবধান হে পাটনীর পো! মাঝখানে একটা 'পাক' আছে, সেটা বাঁচিয়ে চো'লো,—দুর্গা, দুর্গা! গাজী পাঁচ পীর বদর।'

অধর প্রাণপণ শক্তিতে পাকের অনেকটা বাইরে দি'য়েই নৌকা চালিয়ে যে'তে লাগল। 'ওহে একটু ডাইনে, ডাইনে হে!—ওহে বেশী না, আর আধ রশিটাক মাত্তর,—তা' হ'লেই ফাঁড়া কেটে যায়।' এইরূপ নানা জনে নানা কথা বল্‌ছে, আর নৌকা ঝড়ের দাপটে আছাড় খে'তে খে'তে এগিয়ে চল্‌ছে। বৃষ্টি বাদলে, কোথায় কূল-কিনারা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যতদূর দেখা যায়, কেবল একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস, কাণেও এসে বাজ্‌ছে একটা ভীষণ হুস্‌হুস্‌ শব্দ, যেন অনন্ত নাগ ফণা বিস্তার ক'রে সব গ্রাস কর্‌তে উদ্যত হচ্ছে।—'পাক'টা প্রায় ছাড়িয়ে যাবার মত হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এ'সে নৌকার মুখ খানাকে একেবারে পাকের সাম্‌নে এনে ধ'রে দিল। কত কালের ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসী যেন হাঁ ক'রে কেবল তাদেরই অপেক্ষা কর্‌ছিল; যেম্‌নি কাছে আসা, আর টপ্‌ ক'রে সে লোক শুদ্ধো নৌকাখানাকে চোখের নিমেষে গিলে ফেল্‌লে।

* * * * *

তীরে বিস্তর লোকজন জমা হয়েছে। ঝড় জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারা এমনি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, যে যদি এই মুহূর্ত্তেই অধরকে সাম্‌নে পায়ত, ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফে'লে দ্যায়। কেউ বা তার উর্দ্ধতন সাত পুরুষের স্বর্গে যাবার অতি সহজ ব্যবস্থা করছে, কারো বা তাতেও গায়ের ঝাল মিট্‌ছে না। সে আরও সহজ এবং সম্ভবপর ব্যবস্থার উল্লেখ ক'রে বল্‌ছে,—'ওসব রে'খে দাও! ব্যাটাকে আজই বাবুদের কাছে ধ'রে নি'য়ে গি'য়ে আগে ওর পিঠে দু'শো ঘা জুতোর ব্যবস্থা হো'ক, তার পর অন্য কাজ।' কিন্তু এত যে আস্ফালন, এত যে আক্রোশ, সবই নিষ্ফল হ'য়ে গেল ; পারের কাণ্ডারী এপারে আজ আর এল না।

জন

তা

৭

বুড়ী কোন্ সকালে অধরকে দু'টী ভাত খাইয়ে দিয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে বাবুদের পেয়াদা এ'সে তাড়া না দিলে হয়ত সে আজ কাজেই বেরোত না। বেরিয়েছে কেবল পেয়াদার তাড়ায়, আর তার বকুনীতেই। নইলে তার অত অনুরোধ শেষটায় সে রাখলে না কেন ?

সারাদিনের ঝড় তুফান থেমে যেতেই আবার চিক্‌মিকিয়ে একটুখানি রোদ উঠ্‌ল। নিসর্গ লক্ষ্মীর অধরে সে যেন এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি।

বুড়ী রাঁধা ভাত সুমুখে ক'রে সারাটা দিন অধরের জন্য পথ তাকিয়ে ব'সে রইল। শেষে যখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসে তখন কুঠির ঘাটের ঝাউবনের ভেতর থে'কে কেমন একটা অস্ফুট কান্নার আওয়াজ যেন তার কাণে

ভেসে আস্‌তে লাগল,—সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলমালও শোনা গেল। সে আর থাক্‌তে পারলে না। লাঠি ভর ক'রে রামনাম জপ করতে করতে সেদিক মুখো রওনা দিল।

দুঃসংবাদটা রাত্রের মধ্যেই ঝড়ের বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। সকলেই কেবল অধর বেচারার জন্যে হায় হায় কর্ত্তে লাগল। পর দিন সকলেই এ'সে দেখে অধরদের বাড়ী ঘরের দরজা বন্ধ, তার মা যে কোথায় গেছে কেউ জানে না! কেউ বল্‌লে, 'আহা, মাগী নিশ্চয়ই অধরের শোকে জলে ডু'বে মরেছে।' কেউ বা বল্‌লে,—'আহা, বাপু খুঁজেই দেখ না একটু।'

'দায় প'ড়ে থাকে, তুমিই দেখনা বাপু।' ব'লে যে যার কর্ত্তব্য পালন ক'রে চ'লে গেল!

* * * * *

আরও বহুদিন গত হ'য়ে গেছে। কুঠির ঘাটে এখন আর নৌকা পড়ে না। সেই জন্যে সেখানে তেমন লোক জনেরও যাতায়াত নাই। তবু মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক পাকা চুলে বুড়ী সেখান দিয়ে ঘুরছে। কখন বা দেখা যায় লতাপাতা ধূলোবালি এক জায়গায় জড়ো ক'রে আপন মনে বল্‌ছে,—'কই কতক্ষণ ব'সে থাক্‌বো. ভাত সুমুখ ক'রে? অধর ত এখনো এল না? আজ এ'লে খুব ক'রে বক্‌ব।' আবার কাকেও সাম্‌নে পে'লে জিজ্ঞাসা করে,—'তোমরা আমার অধরকে দেখেছ? সে যে আমার বৈতরণীপারে যাবার কড়ি আন্‌তে গেছে! আমার পারের কড়ি!—হাঃ, হাঃ, হাঃ,—আমার পারের কড়ি!' বল্‌তে বল্‌তেই চোখের নিমেষে কোথায় গিয়ে অদৃশ্য হয়।

ভীরা

১

ভীরাদের বাড়ীতে রোজই সকাল বেলায় একটা বৈঠক বস্‌ত। সেখানে চা পান থেকে সুরু করে জাপানের উন্নতি, রুসিয়ার অবনতি প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই আলোচনা হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া, আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করে, সনাতন ভারতবর্ষকেও এদের গণ্ডীর মধ্যে টেনে আন্‌বার চেষ্টা হ'ত। সুতরাং জনকয়েক গুণ্‌তি লোক, যাদের কোন কাজ কর্ম্মের বালাই ছিল না তারাই এসে রোজ রোজ ভীরাদের চা'য়ের টেবিলের চার পাশে মৌমাছির মতন জমা হ'ত। চায়ের গোলটেবিলটা সত্য সত্যই যেন একখানি মধুচক্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাঁধা লোক ক'টা বাদে বাহিরের কারও প্রবেশের সাহস হ'ত না! তার কারণ হচ্ছে এখানকার মৌমাছিদের হুলের ভয়। মৌমাছিদের মধ্যে ওপাড়া থেকে আস্‌তেন আভিজাত্যের অহঙ্কার নিয়ে সীতারামী আমলের জমিদার কুল-তিলক শ্যাম বাঁড়ুয্যে, এপাড়ার বিপিন, চারু, অতুল প্রভৃতি এ কালের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকেরা। এই সব গুণ্‌তি লোকের মধ্যে হঠাৎ সেদিন ধূম-কেতুর মতন গিয়ে উদয় হলাম আমিই একমাত্র নতুন লোক। যা হো'ক এতে কোন পক্ষেরই কোন অসুবিধা হল বলে তেমন বোধ হল না। ভীরার বাবা রমেশবাবু আমাকে ছেলের মতন দেখেন। হঠাৎ সেদিন আমাকে দেখে তিনি যে কাণ্ডটা করে বস্‌লেন, তা আমি জীবনে ভুল্‌তে পারব না।

চা খাচ্ছিলেন, ঝাঁ ক'রে পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। এসেই আমাকে দু'হাতে বুকের ভিতর সাপ্‌টে নিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "মা ভীরু! আর এক পেয়ালা চা নিয়ে এসোত" বলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আমাকে নিয়ে মজলিসটাকে এমন সরগরম করে তুললেন যে, গোলমালের মধ্যে যে তাঁকে একটা প্রণাম করব, সে সুযোগটাও আমার হয়ে উঠলনা। একটু পরেই পাশের দরজার একটা পাটি টুক্ করে খুলে গেল, টিপে টিপে জাপানি ট্রেতে করে একেবারে ৬।৭ পেয়ালা চা নিয়ে এসে ভীরা হাজির। রমেশবাবু আবার অতগুলি পেয়ালার একত্র সমাবেশ দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন "আবার এত চা কেন মা?" ভীরা মৃদুস্বরে উত্তর কর্‌লে, "হিমাংশুবাবু অনেক দিন পরে এসেছেন,—একেবারে একা একা খাবেন" বলেই পাশের শ্যামবাবুর দিকে একটু কটাক্ষ করে বল্‌লে, "কি বলেন শ্যামবাবু!" শ্যামবাবু ভীরার কথার জবাব দিবার পূর্ব্বে রমেশবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠে বল্‌লেন, "বুঝতে পাচ্ছেন শ্যামবাবু! ভীরা কোন্ কথাটা লক্ষ্য ক'রে আজ এ কথাটা বল্‌লে?" শ্যামবাবু বার কয়েক মস্তক কণ্ডুয়ন করে কেমন একটু আম্‌তা আম্‌তা ভাবে জবাব কর্‌লেন, "হাঁ রমেশবাবু! মনে পড়েছে কথাটা। একদিন ভীরাকে এম্‌নি একটা ব্যাপারেই একটু ঠাট্টা ক'রেছিলাম বটে।"

বাক্-চতুর বিপিন শ্যামবাবুকে একটুখানি চটাবার উদ্দেশ্যেই অম্‌নি বলে উঠ্‌লো, "তা'হলেই দেখুন শ্যামবাবু! স্ত্রীজাতিকে আপনারা অবলা এবং অবোলা—দুইই বলে থাকেন, এটা নেহাৎ মিথ্যা।" নারী যে সবলা তার প্রমাণ পাওয়া গেছে তার মাতৃত্বেই। আর অবোলা যে নয় সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কারোই মতান্তর নেই?"

শ্যামবাবু কথাটায় একটুখানি চ'টে গেলেন। তেমনি ভাবেই বলে

উঠলেন "ওই ত হয়েছে তোমাদের দোষ বাপু! মাতৃত্ব ত চিরকালই আছে,—তাতেও ত তা'কে অবলা রমণীই বলে।"

"বলে কখন? না যখন সে স্নেহের কাছে, বাৎসল্যের কাছে কঠোর হ'তে পারে না, তখন। তখনি তার হার, তখনি সে সকল বল হারিয়ে ফেলে হয় অবলা। নইলে একবার ভেবে দেখুন দেখি শ্যামবাবু, যাদের ওপর সমগ্র সমাজের কল্যাণ নির্ভর কর্‌ছে, বুকের রক্ত দিয়ে সন্তানকে মানুষ ক'রে জাতির পুষ্টি সাধন কর্‌ছে, তাদের এখনও বল্‌তে চান অবলা? এখনও কি বল্‌তে চান 'নরকস্য দ্বারংনারী'? ছিঃ!"

শ্যামলাল রমেশবাবু বাদে আর সকলেরই বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই 'বাপু' কথাটা তাঁর মুখাগ্রে এসেই থাকত। তখনি বলে উঠ্‌লেন, "শাস্ত্রে যেমন বলেছে, "নারী-নরকস্যদ্বারং" তেমনি একথাও কি বলেনি "যত্র নার্য্যস্তু রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ।"

বিপিন ভারী মুখর। সে আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না। গর্‌গর্‌ ক'রে বলে গেল, "ভারী ত আমরা নারীকে পূজো করি? পূজোর মধ্যে ত লাঠি, আর ঠ্যাঙ্গা, আরেকটু উপরে উঠ্‌লেই, জুতো, খড়ম, কোন কথাই ভুলিনি শ্যামবাবু! আপনাকে কাকা বলে ডাক্‌তাম এখন কেন ডাকিনে জানেন?" বল্‌তেই শ্যামবাবুর মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। আমি পাশ থেকে একটু চিম্‌টি কাট্‌তেই বিপিন স্পষ্ট করেই ব'লে ফেল্‌লো, "তা বুঝি জানেন না হিমাংশুবাবু? ওঁর অত্যন্ত নারী পূজা দেখেই বাধ্য হ'য়ে আমাকে এত দিনের খুড়ো সম্পর্কটা তুলে দিতে হ'য়েছে। যতগুলি পূজার উপকরণের কথা বল্‌লাম, এর কোনটাই বাদ যেত না। খুড়ী বেচারী ছিল নেহাৎ ভাল মানুষের মেয়ে, তাই ওর মতন"—কথাটা আর শেষ কর্ত্তে হল না। তদ্দণ্ডেই আমি বিপিনের মুখটা এক হাতে চেপে ধরে আরেক হাতে তাকে থামিয়ে রাখলাম।

টেবিলের আর আর ভদ্রলোকদের কেউই কোন রকম উচ্চবাচ্য না ক'রে বেশ মজা দেখ্‌ছিল। শ্যামলাল পুনঃ পুনঃ বিপিনের কাছে ঘা খেয়ে হতাশ ভাবে রমেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "দেখলেন রমেশবাবু কাণ্ডটা! আপনার বাড়ীর ওপরে, আপনার সাক্ষাতে এমন ক'রে আমাকে অপমান! যদি আপনার বাড়ী না হ'ত ত ওর দশাটা কি হত, তা বেশ করে টের পেয়ে যে'ত এতক্ষণে!"

"অর্থাৎ?" বলেই বিপিন একবার হাতের মুঠিটা তাঁকে দেখিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "দেখাতে হলে আপনার মেড়ো দ্বারোয়ানদের দু'চার জনকে একবার পাঠিয়ে দেবেন এই বিপিন বাঁড়ুয্যের কাছে। গেল বারের ঘুসির কথাটা যদি ভুলে গিয়ে থাকে ত এবার এসে একটুখানি ঝালিয়ে নিয়ে যায় যেন। এতে কি বলেন আপনারা সব?"

দলের ভেতর থেকে অতুল বলে উঠ্‌লো "বড়ই বাড়াবাড়ি কচ্ছেন বিপিনবাবু! হাজার হোক, উনি বয়সে বড়।"

"রেখে দিন আপনার বয়সে বড়!…বল্‌ব তা'হলে, উনি কি জন্যে এ বাড়ীতে এত আনাগোনা কচ্ছেন?…এই ভীরা মেয়েটীর জন্যে। রমেশ বাবুকে আমি এখনও সাবধান করে দিচ্ছি! এই শ্যামবাবুর জমিদারীই থাক্‌, আর ওর বয়েস বছর ১৫।১৬ কমে গিয়ে তিরিশে এসেই দাঁড়াক, এমন মহাপুরুষের সঙ্গে ভীরাকে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে তাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা শতগুণে শ্রেয়ঃ। নইলে এতকাল যিনি এ দিক্‌টা মাড়াতেনও না, আজকাল এতই কি তাঁর চা খাওয়ার গরজ পড়ে গেল, যে একদিনও এখানে আসাটা তাঁর বাদ যায় না? শ্যামবাবুর আর যা কিছুরই অভাব থাক্‌ না কেন, চায়ের মতন তুচ্ছ জিনিষটার যে কস্মিনকালেও অভাব হ'তে পারে না, একথাটা আমি হলফ করে বল্‌তে পারি।"

শ্যামলাল নিষ্ফল আক্রোশে কেবল ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন। তাকিয়ে দেখি কি, সকলেই যেন এই দ্বন্দ্বটাকে মনে মনে বেশ উপভোগ করছে। কেবল রমেশবাবু যেন একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মুখের চেহারায় মনে হচ্ছিল, যে অপরাধটা শ্যামলালের একার নয়, কতকটা তাঁরও।

ভীরা ওদিকে নিঃশব্দে টেবিল পরিষ্কার ক'রে চায়ের সরঞ্জাম গুলো নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিপিন তার্কিক ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দুই-ই। সে ভীরার এই চুপচাপ ভাব দেখে আমার গা টিপে বললে, "কাজটা ভাল হল না। ভীরা বড্ড লজ্জা পেয়েছে। বিশেষতঃ ওর সামনে।" আমি সে কথায় কোন উত্তর না করে বরং মনে মনে বিপিনের স্পষ্টবাদিতার প্রশংসাই করতে লাগলাম। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না এই ভেবে যে অতিরিক্ত প্রশংসার হাওয়াতে বিপিনকে ফুলিয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। লোকটা স্পষ্টবাদীই হোক্, আর যাহাই হোক, অসহ্য দাম্ভিক। ওরূপ লোককে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়াও অধর্ম্ম।

হঠাৎ খট্ করে আবার পাশের দরজাটা খুলে গেল। দেখি, ভীরা তার হাতে একখানা রূপার রেকাবিতে কতকগুলি পানের খিলি ও চুরুট। এবারে বোধ হয় ভীরার পুনরাগমনের জন্যই হোক কিংবা উপস্থিত সকলের চুপচাপ থাকার দরুণই হোক্, শ্যামলালবাবু আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারলেন না। "তাহলে আসি রমেশবাবু! নমস্কার!" বলেই বড় গম্ভীর ভাবে তিনি প্রস্থানের উদ্যোগ করতেই দলের ভিতর থেকে অতুল বলে উঠল, "বসুন না শ্যামবাবু! আমাদেরও ত বাড়ীঘর আছে।" সে কথায় চারু ও আমি একটুখানি না হেসে পারলাম না। কিন্তু বিপিন কট্মট্ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে, ইসারায় জানিয়ে দিল 'থাক্ না।'

শ্যামবাবু অতুলের কথায় কোন জবাব না করে, কারো দিকে না তাকিয়ে শুদ্ধ রমেশবাবুকে আরেকটা ছোট নমস্কার করে, ওদিককার বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রমেশবাবু একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপিনের পানে তাকিয়ে বল্‌লেন, "জানো বিপিন! এটা একটা দস্তুর মত লাইবেল! শ্যাম যে চুপ করে থাক্‌বে এমন ত মনে হয় না।"

বিপিন সে কথায় একটুখানি উদ্দৃপ্ত স্বরে বলে উঠ্‌ল, "সত্যি কথা বল্‌তে কাউকে কসুর করব না রমেশবাবু! তা শ্যামবাবুই হন, আর আমাদের মনিব জমিদার মশায়ই হন। জানি মানুষের অপ্রিয় হবার যত-গুলি উপায় আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারো দোষ অপরের সাম্‌নে ধরিয়ে দেওয়া। এর যে একটা মন্দ উদ্দেশ্য আছে, তা নয়। এতে করে তার দোষটা ক্রমশঃ শুধরে যায়, যদি মনুষ্যত্ব বলে কিছু তার ভেতরে থাকে।"

"তাত বটেই! কই ভীরু চা খেলিনে?" বল্‌তেই দরজার খোলা পাটিটার আড়াল থেকে ছোট একটা উত্তর পাওয়া গেল "আমি চা খেয়েছি বাবা।" বলেই কোমল পদক্ষেপে সে যে সেখান থেকে চলে গেল তা বেশ বোঝা গেল। এইবারে রমেশবাবু বিপিনকে একটু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বিপিন! কথাটা তুমি কার কাছে শুন্‌লে?"

"শুন্‌তে আর বাকী কার কাছে বলুন? আপনি চিরকাল বিদেশে কাটিয়ে বাড়ী এসেও বসেছেন একেবারে চুপ করে। আপনার বাড়ীর সীমানার বাহিরে কি হচ্ছে, তা'ত আপনি জানেন না। শ্যাম তার মতলবটা অনেকের কাছে প্রকাশ করেছে। বাকী ছিলাম আমি,—আমিও আগ্রহ করে জিজ্ঞেসা কর্‌তেই আমাকেও সে বল্‌তে বাকী রাখেনি, Scoundrel কোথাকার! কোথায় ভীরা, আর কোথায় শ্যাম,

রমেশবাবু! ভীরা আজীবন কুমারী থাকবে সেও ভাল। তবুও অমন অসভ্য বর্ব্বরের সঙ্গে ওর কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবেন না। যদিই দেন ত শ্যামকে নিয়েই থাকতে হবে আপনাকে, সে কথা কিন্তু আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।"

"নিশ্চয়! একশ বার! যখন জানতে পারা গেল, তখন আগেই ওকে সম্‌ঝে দেওয়া যাবে।" রমেশবাবু কথাটা বল্‌লেন বটে, কিন্তু তাঁর ভিতরে তেমন একটা দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল না।

আবার দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল ভীরা। ঢুকেই একটু যেন প্রভুত্বের সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "বাবা! আজ না সকাল সকাল তোমার গরম জলে নাইবার কথা, তা' মিছে-মিছি এত দেরী কচ্ছ কেন?" বলেই যে ভাবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল, তা'তে প্রকারান্তরে আমাদের সবাইকে জানিয়ে দিয়ে গেল, যে অনাবশ্যক বাদবিতণ্ডায় সময় নষ্ট করবার আমাদের ফুরসৎ যতই থাক্, অন্ততঃ তাদের কারোই নাই। আমি অতুলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌লাম, "চলহে অতুল যাওয়া যাক্।" বলেই আমরা দুইজন যেমনি ওঠা অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিপিন ও চারু উঠে পড়ল।

২

ভীরার প্রকৃত নাম হচ্ছে ভৈরবী, তার ঠাকুরমার দেওয়া। কিন্তু তার পিতার নব্যতন্ত্রের শিক্ষা দীক্ষার ফলে বাড়ী থেকে ঠাকুর দেবতার পূজা অর্চ্চনা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত ঠাকুর দেবতার নাম রাখা উঠে গিয়েছিল। তাই রমেশবাবু ভৈরবী নামটাকে

ছোটখাটো এবং পরিমার্জ্জিত করে 'ভীরা' ক'রেছিলেন। ভীরাকে তিনি অতি শৈশবেই মিশনারী ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন। পরে বাড়ীতেই মাষ্টার রে'খে ইংরেজী, বাংলা এবং সেই সঙ্গে শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাও শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন আর তাকে আগের মতন মুখস্থ ক'রেও পড়া শিখ্‌তে হয় না, বা হারমোনিয়মের সঙ্গেও গলামিশিয়ে নিবিষ্ট ভাবে 'সা' 'রে' 'গা' 'মা' সাধ্‌তে হয় না। ওসব বিদ্যা তার একরূপ আয়ত্ত হয়েই গেছে। তবে পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে গান-বাজনা সব সময়ে পোবায় না—কেননা এখানকার যে সমাজ, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান, অন্যদিক দিয়ে যতই প্রকাশ পাক আর নাই পাক্‌, নারী জাতির বিচারের বেলায় খুবই প্রকাশ পেয়ে থাকে। একটু কিছু একচুল এদিক্‌ ওদিক্‌ হ'লেই অমনি মোড়ল মুখুয্যে মশা'য় টাকের পাশ থেকে সূক্ষ্ম টিকিটী নে'ড়ে বলে উঠ্‌লেন 'হুঁ! অমুকের মেয়েত! কর ওকে এক ঘরে।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেব বিদ্যারণ্য মশায়ও মনু থেকে এক ঝুড়ি শ্লোক আবৃত্তি ক'রে মুখুয্যে ম'শায়ের কথার সমর্থন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। পল্লী-সমাজের যেখানে এমন কড়াকড় বিধি ব্যবস্থা, যেখানে হাতে হাতে স্বর্গ নরকের দোর খোলা, সেখানে রমেশবাবুর সাধ্য কি, যে এমন সব গুরুতর অনুশাসনগুলিকে উপেক্ষা ক'রে চলেন। এক সকালবেলা চা খাওয়া অভ্যাস, তা'ও হয়ত চুপে চুপেই সারতে হ'ত। কিন্তু পাড়ার কয়েকটী ছোক্‌রা এসে জোটাতে বিশেষতঃ বনিয়াদী জমীদার শ্যামলালের শুভাগমনে কারো আর বল্‌বার কিছুই রইল না। তবে ছোট লোকদের কেউ কেউ বল্‌ত, 'সদর-আলা রমেশ বাবু দেশে এসে সকলকে খিষ্টেন ক'রে দেছে'। কার বাপু গরজ পড়েছে এই সব ছোট লোকের ছোট কথায় কাণ দেবার। তবে যাঁদের কথায় সময় সময় কাণ দেবার দরকার হ'য়ে পড়ত, তাঁরা টিকি নাড়ার দল। শেষে যখন তাঁরাও রায় দিয়ে বস্‌লেন,

যে বিনা স্নানাহ্নিকে চা পান ব্রাহ্মণের পক্ষে সমাজের রীতি বিরুদ্ধ হ'লেও নীতি বিরুদ্ধ নয়, তখন আর পায় কে ? চা পত্রের রস যে দুগ্ধ শর্করা ও তপ্তবারি সংযোগে সোমরসে পরিণত হয়, অনেকেই এইরূপ অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার ক'রে চায়ের আবিষ্কর্ত্তা চীনা জাতিকে দেবতার বংশধর ব'লে প্রমাণ ক'রে আশ্চর্য্য রকম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেও কেউই বড় পশ্চাৎপদ হলেন না। তর্কচঞ্চু মশায়দের অনেকেরই তখন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্রমাগত কফাক্রান্ত হ'তে লাগল। তাই সময়ে অসময়ে এই অপূর্ব্ব ভেষজের সন্ধানে খিষ্টেন রমেশবাবুর বাটীতে তাঁদেরও বড় ঘন ঘন শুভাগমন হ'তে লাগল। কিন্তু বিপিন প্রভৃতির উৎপাতে দু'চার দিনের মধ্যেই যঃ পলায়তে সঃ জীবতে নামক নীতি বাক্যের অনুসরণ করে তাঁরা সরে পড়লেন। এতে ক'রে রমেশ বাবুরও যেমন সমাজের উপর একটা মস্ত জোর দাঁড়াল, বিপিন প্রভৃতিরও খুব সাহস বেড়ে গেল। কথায় কথায়ই রমেশবাবুকে সাহস ভরসা দিয়ে তারা বল্‌ত, 'দেখব কোন্ ব্যাটা আর আপনাকে খিষ্টেন বল্‌তে সাহস পায় ? তাহ'লে ওই তর্কচঞ্চুদের এবার টিকি কাটা যাবে না ?······মাথা মুড়োনো ত পরের কথা !'

বিপিনদের নিয়ে রমেশবাবুর চায়ের মজ্‌লিস এই ভাবেই বস্‌ত। সেদিন আমি গিয়ে পড়াতে তাদের আরেক জন এসে ভাগীদার জুটল। কিন্তু সেদিনকার বিবাদের পর থেকে শ্যামবাবুকে আর প্রাতঃকালীন চায়ের টেবিলে দেখা গেল না। সেদিন রমেশবাবু কি কথায় কথায় বলে বস্‌লেন 'তাই ত হে বিপিন ! শ্যাম যে একেবারেই আসা ছেড়ে দিল !'

বিপিন তৎক্ষণাৎ টিপ্পনী কে'টে ব'লে উঠ্‌ল 'যদি বলেন ত এক্ষুণি গিয়ে ঘাট স্বীকার ক'রে মহাপুরুষকে হাতে পায়ে ধ'রে সে'ধে নিয়ে আসিগে !

বিপিনের কথার তীব্রতায় রমেশবাবু এমনি একটু বেসামাল হ'য়ে

পড়্লেন যে, সহসা তার একটা উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেলেন না। কতকটা অপরাধীর মতন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে উত্তর করলেন, 'না হে বিপিন! আমি তেমন কিছু মনে ক'রে জিজ্ঞাসা করিনি।' বিপিন খোঁচা দিতে ত চিরদিনই অদ্বিতীয়। অমনি পাল্‌টা জবাব দিয়ে বস্‌ল, 'যাক্ যাক্, যেতে দিন রমেশবাবু! এতকাল ধ'রে শিক্ষাদীক্ষার গুণে সমাজের উন্নতি কামনার চেষ্টা ক'রেও যে আপনি এমন বড়লোকঘেঁসা হ'য়ে পড়বেন, এইটেই হচ্ছে সব চেয়ে দুঃখের বিষয়!'

বিপিনের এই স্পষ্টবাদিতার মূল্য যাই থাক্, যখন রমেশবাবুর মতন লোককে এত বড় কথাটা অনায়াসে ব'লে ফেল্‌লে, তখন আমিত অবাক্ হ'য়েই গেলাম। চে'য়ে দেখি, চারু অতুল প্রভৃতির মুখও একটা অপরিসীম লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠেছে। রমেশবাবু গম্ভীর হ'য়ে ব'সে আছেন। কেবল লজ্জা দেখ্‌লাম না বিপিনের। এমন বেপরোয়া মানুষ আমার জীবনে আর দু'টী চক্ষে দেখিনি। বিপিন এদিন আর বেশী কথা না ব'লে এইটুকু মাত্র উপসংহার কর্‌লে 'না রমেশবাবু! কাল থে'কে আর আমিও আসচিনে।'

ভীরা হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল, 'কেন বিপিনবাবু! আপনার আবার কি হ'ল?'

'সে কথাটা নাই বা শুন্‌লে'—'কেন শোনায় দোষ আছে কিছু?' ব'লে অতুল একটু তীব্র স্বরেই যেন বিপিনকে কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

বিপিনের লড়াই করার স্বভাব যাবে কোথায়? তাব একটুও আট্‌কাল না। অম্‌নি বলে বস্‌ল 'আসাও নিজের ইচ্ছা, না আসাও নিজের ইচ্ছা। এর আবার একটা জবাব দেবার কি আছে,?' বলিয়াই উঠে রমেশবাবুর দিকে তাকিয়ে একটী ছোট নমস্কার ক'রে বেরিয়ে পড়্‌ল। যেতে যেতে একটুখানি পেছন ফিরে আবার বলে গেল, 'রমেশবাবু!

ভদ্রতার যদি আমার এতটুকুও জ্ঞান থেকে থাকে ত, আপনার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে আপনাকে অপমানসূচক কথা বল্‌বার আমার কোনোই অধিকার নেই। সেই অধিকার হঠাৎ একবার যখন নিয়ে বসেছি, তখন আর জেনে শুনে তার দাবী চালাতে চাইনে। তাতে মনুষ্যত্ব বল্‌তে আর কিছুই আমার ভিতরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন না মানুষটা আমি যত মন্দ নই, আমার মুখখানা তার চাইতে ঢের বেশী মন্দ। তাই প্রশংসা আমার অদৃষ্টে যতই জুটুক্, নিন্দা জুটেছে তার চেয়ে ঢের বেশী। সে নিন্দা আর কিছুই নয় 'আমি অভদ্র, গোঁয়ার' ইত্যাদি। মরুকগে সে কথা। এখন আসি নমস্কার!'

বিপিনের সেদিন ওভাবে চ'লে যাওয়াটা ভাল কি মন্দ, সেটা বিচার কর্‌বার আগে এ কথাটা স্বীকার কর্‌তেই হবে, যে তার মধ্যে ভদ্রতার একটু ক্রটী ছিল। ব্যাপারটা সেদিন আমাদের তেমন খেয়াল না হ'লেও পরদিন যখন সত্যই বিপিনকে আর চায়ের টেবিলে দেখা গেল না, তখন তার এই ভদ্রতার অভাবটা তীব্র ভাবেই অনেকের চোখে পড়্‌ল। বিশেষতঃ ভীরার। সে চা পরিবেশন কর্‌তে এসে স্পষ্টই বলে বস্‌ল "বাবা! বিপিনবাবুরা লঘু গুরু সম্পর্ক না মে'নে নিজেরা যা তা বকাবকি কর্‌বেন ভদ্রলোকের বাড়ীর ওপর ব'সে, অথচ নিজেরা দূরে থে'কে দোষী সাব্যস্ত কর্‌তে চান্ এই নিরীহ বেচারীদের। তোমরা বিপিনবাবুকে যাই বল, আমি এমন লোককে Humbug ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে চাইনে। বল্‌তেই একটা অপরিসীম লজ্জায় তার মুখখানি আকর্ণ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

চেয়ে দেখি চারুর মুখে চোখে যেন হাসি উথ্‌লে পড়্‌ছে। অতুলও যে সেটা লক্ষ্য না কর্‌ছিল, এমন নয়। ভীরার মুখে বিপিনের নিন্দা চারু এই প্রথম শুন্‌তে পেল। এই নিন্দার সঙ্গে যে চারুর একটা গুপ্ত স্বার্থের

যোগ ছিল, সেটাও অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারা গেল। কেন না সেই মুহূর্ত্তেই চারুও বেশ রসাল ক'রে দু'কথার অবতারণা না ক'রে ছাড়্‌লে না। বল্‌লে 'ভীরা ঠিক খাঁটী কথাই বলেছে। ভদ্রতার জ্ঞান যাদের এত কম, তাদের ভদ্রলোকের বাড়ীতে আস্‌তে দেওয়াই উচিত নয়।'

কথাটায় কেউই কোন প্রকার জবাব বা প্রতিবাদ কর্‌লে না। যেতে যেতে অতুল আমাকে বল্‌লে, 'আমিও আর কাল থেকে আস্‌চিনে।' কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে বল্‌লে 'কি কাজ ভায়া! বড় লোকের মোসাহেবী করে? যেখানে কেউ কোন স্পষ্ট কথা বল্‌লে তার মানমর্য্যাদা থাকে না, সেখানে কে যাবে মিছে মিছি মান সম্ভ্রম নষ্ট করতে। বিপিন কিছু মন্দ কথা বলেনি। বড় লোক ব'লে যে উনি শ্যামবাবুকে অতটা খাতির করেন, এ কথাটা কি অস্বীকার কর্‌বার জো আছে? রমেশবাবু সদর-আলা হ'লেও আর ক'বছর সদর-আলাগিরি করেছেন। বরাবরই ছিলেন মুন্সেফ। তা সাহেবীয়ানা কর্‌তে গেলে মুন্সেফীর আয়েতে কুলোবে কেন? কাজেই কিছু জমাতে পারেননি। যা পেন্‌সন পান, তাহাতে সহরে থাকা পোষায় না বলেই পাড়াগাঁয়ে এসে বাস কর্‌চেন খরচ কমাবার জন্তে। নইলে পল্লী বিদ্বেষ ত ওঁর একরূপ মজ্জাগত ছিল। এতটা অভাবও হ'ত না, যদি না speculation কর্‌তে গিয়ে বিস্তর টাকা লোকসান দিয়ে না বস্‌তেন। তাইতেই ত দেনাও যথেষ্ট। এখনও মাঝে মাঝে হাতটান হ'য়ে পড়ে, আর অমনি শ্যাম বাবুর কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। ব্যাপার ত হ'ল এই; এ দিকে শুন্‌তে পাচ্চি যে শ্যামবাবুর কাছ থেকে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে একটা বিষয় কর্‌বেন। কথাটা শুনে একটুখানি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। অমনি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, যার এত ঘন ঘন হাতটান, তাকে শ্যামবাবু কোন্ সাহসে ৫০০০৲ টাকা ধার দেন? "বাঃ! শ্যামের টাকা খাবে কে বলত? যাক্ তবু যদি টাকার বদলে রমেশ বাবুর অমন লক্ষ্মীর মতন

মেয়েটী পায় ত ক্ষতি কি ?" তাই নাকি ? ব'লে আমি অতুলের মুখের পানে তাকাতেই সে আমার দিকে ঘাড় উঁচু করে তু'লে যথা সম্ভব দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লে 'নয় ত কি বিপিন অমনি অমনি একটা মেলো কথা শ্যাম বাবুর নামে রটাতে সাহস পেল ? দেখতে পেলে না যে এত বড় কথাটা শুনেও রমেশবাবু কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। মুখে কেবল বল্‌লেন, সাবধান করে দেওয়া যাবে। কিন্তু সাবধান করবার মত শক্তি কোথায় ? আর সত্যই যদি না হবে ত, শ্যামই কি অম্‌নি অম্‌নি রেহাই দিয়ে যেত ?··· কথ্‌খনও না ! যতদূর জান্‌তে পাচ্চি, এতে ৫০০০৲ হাজার টাকাও বোধ হয় এতদিন নেওয়া হ'য়ে গেছে।

বল কি ? বলেই তাকে একরূপ ঠেলে ফেলে দিয়ে রমেশবাবুর বাড়ীর ভিতর গিয়ে ঢুকে পড়লাম। রমেশবাবু ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন, ভীরা চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলুচ্ছিল, চারু রমেশবাবুর সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে এক একবার ভীরার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। দৃশ্যটা আমার আদৌ ভাল লাগছিল না। এম্‌নি ভাবে যে একটী অনূঢ়া যুবতী অপর একটী অবিবাহিত যুবকের পিপাসু-দৃষ্টির সামনে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারে, এটা আমি ভাবতেই পারিনে ! তখনি গিয়ে চারুকে শুনিয়ে শুনিয়ে রমেশবাবুকে বল্‌লাম, 'রমেশবাবু ! সকাল বেলার এই চায়ের মজলিস্‌ ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারেন ? এটা পাড়াগাঁ, এখানে এত মজলিসের দরকার কি ?' বলেই ভীরাকে সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে ইসারা কর্‌লাম। ইসারাটা কতক পরিমাণে চারুকে লক্ষ্য করে, সেটা যেন সেও বুঝতে পার্‌লে। তখনি সে কতকটা যেন লজ্জায় কতকটা যেন দ্বিধায় সেস্থান ত্যাগ করে উঠে চ'লে গেল। ভীরাও সেখান থে'কে চ'লে যেতেই রমেশ-বাবুকে সাম্‌নাসাম্‌নি ব'সে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আপনার এত কি টাকার দরকার রমেশবাবু ? দরকার হয় আমি দেবো !'

হঠাৎ টাকার উল্লেখ শুনেই লজ্জায় রমেশবাবুর মুখখানা এতটুকু হ'য়ে গেল।

আমি তখনকার মত দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়লাম।



পরদিন সকালে রমেশ বাবুদের বাড়ী যাইনি দেখে প্রত্যুষেই এক তাগিদ এ'সে হাজির। রমেশ বাবুর মুসলমান ভৃত্য ফৈজু একখানা চিঠি এ'নে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে, "বাবু! তাঁরা সব বসে আছেন, না গেলে হবে না।"

জিজ্ঞাসা করলাম 'তারা কে কে ফৈজু?'

'আজ্ঞে বাবু, আর দিদিঠান্‌।'

'কেন অন্য দিনের বাবুরা আসেননি?'

'আজ্ঞে কৈ? তেনারা ত কেউই আসেননি বাবু।'

ভীরাদের বাড়ীতে সকাল-বেলা আর চা খেতে যাব না ব'লে মনে ঠিক দি'য়ে ছিলাম; কিন্তু ফৈজুর এই ছোট্ট উত্তরে বুকটার ভিতরে কেমন তোলপাড় ক'রে উঠ্‌ল। তখনি ফৈজুকে বিদায় দিয়ে ভীরাদের বাড়ী মুখো রওনা দিলাম। কিন্তু তাদের বাড়ী ঢুকতেই চা খাবার উৎসাহটা আমার যেন একেবারেই কমে গেল। এত লোক থাকতে রমেশ বাবু বেছে বেছে কেবল আমাকেই ডে'কে পাঠিয়েছেন কেন? বোধ হয়, কাল যে টাকার কথাটা ব'লেছিলাম, হয়ত বা তারই সম্পর্কে। কিংবা তা' নাও হতে পারে·········সে যাই হোক, যে আমি কাল নিজের

মুখে রমেশ বাবুকে ব'লে গেছি চায়ের মজলিস্ ভাঙ্গতে, সেই আমিই আজ আবার কোন্ মুখে চলেছি চা খে'তে। ধিক্ আমাকে! একটা দুর্ব্বিসহ ধিক্কারে আমার ভিতরটা যেন দাউ দাউ ক'রে উঠ্‌ল। তবুও গেলাম, একটা অস্বস্তি নিয়ে।······ আজ ভীরাকে যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে হাল্‌কা দেখ্‌লাম। যাক্ শুভলক্ষণ! মনের কোণে যে একটা 'কিন্তু' ছিল, সেটা অচিরাৎ কে'টে গেল। আজ রমেশ বাবু চট্‌পট্ ক'রে চা খে'য়ে জলের গাড়ু হাতে ক'রে বাইরে গেলেন। যাবার সময় আমাকে ব'লে গেলেন, "আমার না ফেরা পর্য্যন্ত একটু বোসো। দেখিস্ মা ভীরু! হিমাংশুর পান টান যা' দরকার হয় দিতে ভুলিস্‌নে যেন।"

নির্জ্জন ঘরের মধ্যে একটী অনূঢ়া সুন্দরী যুবতী ও একটী যুবক। মনে যত সরলতাই থাক্, হৃদয়ে যত বলই থাক্, কই কারো ত মুখ দি'য়ে একটী কথাও বের হ'ল না। কৈ? ভীরা ত একটী বারও তার পিতার কথা মত কাজ কর্‌লে না! তার এই মৌন-গম্ভীর ভাব অপরের চক্ষে যেম্‌নি ঠেকুক, আমার চক্ষে বড়ই সুন্দর ঠেকতে লাগ্‌ল। তথাপি এই লজ্জানতাকে এরূপ ভাবে অধিক্ষণ চুপ ক'রে থাক্‌তে দিতেও আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। তখনি পান চাইলাম, অমনি পান এসে হাজির। তারপর বল্‌লাম 'এখন যাই ভীরা!' সে' কথায় সে উত্তর দিলে, 'বাবা যে বস্‌তে ব'লে গেলেন হিমাংশু বাবু!' ব'লেই হঠাৎ যেন লজ্জায় মুখখানি রাঙ্গা ক'রে ফিরিয়ে নিলে।

আমি অমনি ব'লে বস্‌লাম, 'বস্‌তে ত বল্‌চ ভীরা, কিন্তু বোবার মতন চুপ ক'রেই বা কতক্ষণ ব'সে থাকা যায় বলত?'

ভীরা উত্তর কর্‌লে 'তা হ'লে গল্প বলুন শুনি।'

ইতি মধ্যেই দরজায় রমেশ বাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বাঁচলাম গল্প বলার দায় থে'কে এইবারে কোনো রকমে রমেশ বাবুকে একটা নমস্কার ক'রে পালাতে পারলে বাঁচি।

রমেশ বাবু ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন, ভীরা এক কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও তাঁকে দেখেই হঠাৎ বিদায়ের নমস্কারটা দিয়ে বসলাম। জানিনে এতে তিনি কি মনে ক'রে কেমন একটুখানি সন্দেহের চক্ষে একবার ভীরার দিকে, আরেক বার আমার দিকে তাকালেন মাত্র। কিন্তু মুখে কোন কথাই বললেন না।

বাড়ী এ'সে যেন বুকটার মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় জ্বালা ক'রে উঠল। খাটের উপর শয্যায় শু'য়ে শু'য়ে কেবলি ভাবতে লাগলাম, সকাল বেলার কথাটা। কেনইবা গেলাম? আর যদিই বা গেলাম ত অমন ক'রে হঠাৎ চলেই বা এলাম কেন? রমেশ বাবুর মনে নিশ্চয়ই একটা বিশ্রী ধারণা ঢুকেছে। যাক্ আজ আর না! কালই প্রাতে গিয়ে এর একটা বিহিত ক'রে আসতে হ'বে।

পরদিন সকাল বেলা যেতেই দেখি, বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ। ফৈজুকে জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম "আজ বাবু আর দিদিঠান্ ভিতরে চা খেয়েছেন। আর নাকি বাইরের ঘরে এখন থেকে চা খাবেন না।"

তা না খেলেন চা। কিন্তু নিষ্ঠুরের মতন বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কেন এই হতভাগ্যের জীবনের সকল দিক্‌কার দরজাই বন্ধ ক'রে ফেললেন। কি অপরাধ এ বেচারীর? সেই ব্রীড়া-বিনম্রা, কার্য্যকুশলা সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি—ভীরাকে চোখের আড়াল রে'খে কি লাভ তাঁর? মানুষ কি এমনি নিষ্ঠুর!·········সত্যি কথা বলতে কি ভীরাকে ভাল বে'সে ফেলেছিলাম! কিন্তু এ ভালবাসার এতটুকু অর্ঘ্যও যে তা'কে নিবেদন ক'রে দিতে পারলাম না। সবই যেন স্বপ্নের মত একান্ত মিথ্যার

ফাঁকি।……..আকাশের পানে তাকিয়ে দেখি সব নিস্পন্দ, নিথর, ঠিক যেন আমারি স্পন্দনহীন হৃদয়ের মত। মাথার মধ্যে বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে লাগল। কেমন ক'রে যে মাতালের মতন টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ফি'রে এলাম, বল্‌তে পারিনে।

৪

রমেশ বাবুর উপর আমার যে একটা উচ্চ ধারণা ছিল, সেটা দূর হ'য়ে যে'তেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কুধারণা তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে এ'সে উপস্থিত হ'তে লাগল। মুখে যতই সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা করুন, আদতে লোকটা ঘোর স্বার্থপর, এবং যাকে ভদ্র ভাষায় বলে কূট-কৌশলী, অনেকটা তাই। টাকার লোভে এবং আভিজাত্যের খাতিরে তিনি শ্যামলালের মত লোকের হাতে কেন, বোধ হয়, জলেও একমাত্র কন্যাকে চির দিনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে পারেন। লোকটার উপর যা কিছু শ্রদ্ধা ছিল, তা'ত গেলই, বরং ভয়ঙ্কর একটা ঘৃণা যেন সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে আমার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত বিষাক্ত ক'রে দি'য়ে গেল। ওঃ! এঁর বাড়ীতে চা খেয়েছি ত না, বিষ খেয়েছি। যদি পারতাম ত আজ এই মুহূর্ত্তেই রমেশ বাবুর সাম্‌নে এই বিষ উগরে ফেলে দিয়ে চলে আস্‌তাম। ব'লে আস্‌তাম তুমি ছোট লোক—ইতর।……..সে কাজটা যখন একান্তই অসম্ভব, তখন তিলার্দ্ধও সেখানে অপেক্ষা করলাম্ না। দ্রুত পদে বাড়ী ফি'রে এলাম।………

এর সাত দিন পরেই বন্ধুবান্ধবদের না জানিয়ে কর্ম্মস্থলে ফিরে গেলাম। যাবার পরই বদলীর হুকুম হ'ল।

বিদেশ—ঘোর বিদেশ!·········এক মুহূর্ত্তও মন টেকে না। কই সেই সব বন্ধুবান্ধব, যারা তাদের হৃদয় ভরা স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে আমাকে বিদেশের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিয়ে ছিল! এখানে ত তাদের মতন একটীও নাই! সেই বিপিন, চারু, অতুলের মতন গ্রামবাসী সুহৃৎরাই বা কোথায়? আছে কেবল আফিসের সাহেব, বড় বাবু, এবং দু'চারজন দেশী ও বিদেশী কেরাণী। তাদের মুখে কেবল আফিসের কাজের কথা। একটী সদালাপও যেন কারো মুখে থাকৃতে নাই। হায়রে কেরাণী-জীবন! এমন জীবনও নাকি হে'সে খে'লে কাটানো যায়? যায়ও ত দেখি। আমারই মতন যারা কেরাণী, তাদের দেখে'ত মনে হয় আমার চাইতে তারা ঢের বেশী সুখী। কেবল সুখের পথে যত প্রতিবন্ধক আমারই! আমারি জীবনটাকে অহোরাত্র এমন এক ভীষণ দারিদ্র্যের জাঁতায় পিষতে লেগেছে যে, তা' থে'কে এক লহমার জন্যও হাঁফ ছে'ড়ে বাঁচবার উপায় নাই।

এক একবার বাবার উপর ভয়ঙ্কর রাগ হ'তে লাগল এই ব'লে যে, কেন তিনি তাঁর একমাত্র বংশধরের জন্য অমন দশ বিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখে যান নাই। তা হ'লে ত তার জীবনটা দিন রাত অমন ক'রে দুর্ভোগের বোঝা বয়ে বেড়াত না! ·····যদি বল···ভীরার কথা, সেই বা মিথ্যা কি?···তা'হলে তাকেই কি অমন দু'পাঁচ হাজার টাকার জন্যে তার কশাই বাপ···উঃ···অমন করে বলি দিতে সাহস পায়?—যে কয় হাজার টাকা এই চাকৃরীর জীবনে জমিয়েছি, তাই দিয়ে কি ভীরাকে উদ্ধার করা সম্ভব? আমার নয় দু'এক হাজার মজুতই আছে; কিন্তু সে কি শ্যামের টাকার কাছে একটা টাকা! এমন দু'চারটে টাকা অনেক বিধবারও থাকে। আরও এক কথা শ্যাম জমীদার—আভিজাত্যের একটা প্রকাণ্ড গর্ব্ব তার আছে। আর আমার আছে কি?—আমার

রক্ত মাংসের দেহটা, আর এর ভেতরে আছে একটা প্রাণ। হাঁ এইটাই আছে বটে থাক্‌বার মতন একটা জিনিস, যা' নিয়ে একটুখানি গর্ব্ব করা চলে। কিন্তু এই প্রাণ দিয়েই কি সব সময়ে মানুষের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় হয়ে থাকে?

প্রাণের যে একটুখানি গর্ব্ব করি, সেই প্রাণেই বা আছে কি? আছে ত কেবল দুঃখের গান। যদি চ কবি ব'লেছেন দুঃখের কথা যে গানে ধরা পড়ে, সেই সমস্তই হচ্ছে সবচেয়ে মধুরতম গান,—তথাপি এই কথাটাই আমার অনবরত মনে হয়, যে অতিরিক্ত দুঃখের মধ্যে বা মধুর গান কি করে প্রাণ হ'তে বেরোয়? কূপ থেকে অনবরত জল তুল্‌তে তুল্‌তে অবশেষে পাঁকইত উঠ্‌তে থাকে!

কবিতায় যা কিছু লিখতে যাই, কলমের মুখে এসে পড়ে ভীরা, সেই মৌন-মধুর মূর্ত্তিখানি, সেই সজল আয়ত চক্ষু দু'টী, সেই আধ ভয়ে, আধ সঙ্কোচে ঘেরা লাজুক চোখের চকিত চাউনি! হায় সে যে চুপ ক'রে কত কথাই না ব'লে গেছে!

সারা দিনের কাজ কর্ম্মের ভিতরে কেবল এই সকল কথাই মনে পড়্‌তে থাকে। বিকালে পার্কে বেড়াতে যাই,—সেখানেও শান্তি নাই। চারিদিকে দলে দলে লোকজন গল্প গুজব করে বেড়ায়। দেখে শুনে মনে হয়, যেন এই সুখের জগৎটা বিশ্ব-শ্রষ্টা তাদেরই ভোগের জন্য তৈরী করেছিলেন। এর আকাশ বাতাস ফলফুল পাখীর গান, কোন কিছুরই সঙ্গে যেন আমার কোন সম্বন্ধ নাই! তবুও আমি এদেরি মতন মানুষ! ওঃ! সেটা বাইরে, ভিতরে নয়। এদেরি ভিতরটা স্বর্গের নন্দন কানন, আর আমার দুর্গম মরুভূমি!

বাসায় ফিরে আসি,—কি ভাবে যে বল্‌তে পারিনে! তবে মনে পড়ে আমাকে রাস্তায় চল্‌তে দেখে কেউ কখনো মাতাল বলেছে, আবার কেউ বা আমার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে বলেছে—'পাগল'।

এই সময়টায় এক একবার রমেশ বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বার ইচ্ছা হত। কিন্তু সে ইচ্ছাটা জানিনে কেমন ক'রে মনের মধ্যেই মিলিয়ে যেত। একেত হঠাৎ ছুটি পাওয়া দায়! তারপর যদিও চাকুরী রিজাইন দিয়ে যাবার স্বর্ণ-সুযোগ যখন তখনই এসে উপস্থিত হত, তবুও বল্‌তে পারিনে, কোন্ দুর্নিয়তির প্রেরণায় সে সুযোগটা ত্যাগ করতে বাধ্য হতাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা হলুদের ফোঁটা দেওয়া চিঠি আমার নামে এসে উপস্থিত। চিঠি খুল্‌ব কি, হাত কাঁপতে লাগল, বুকের ভিতরটা দুরদুর করতে লাগল। দেখি কি, যা ভেবেছিলাম, তাই। ভীরার বিবাহ শ্যামের সঙ্গেই। কোন্ তারিখে, কোথায়, সে সব কিছুই পড়া হল না। দিনের উজ্জ্বল আলো কেমন ম্লান হ'য়ে এল। চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগলাম।



ছয়মাস কেটে গেছে। জগতের কারো সনে আর কোনো সম্বন্ধ নাই। আগের চাকরীতেই বহাল আছি। হঠাৎ সেদিন টিফিনের সময় বড় বাবুর সঙ্গে সিঁড়ির উপর দেখা। জানিনে, আমার কোন্ জন্মের সুকৃতির ফলে তিনি একটিবার আমার মুখের পানে তাকিয়েই আচমকার মতন বলে উঠলেন, "ব্যাপার কি! বড্ডই যে রিডিউস্ হয়ে গেছ হে হিমাংশু" মাথা চুলকাতে চুলকাতে যা তা একটা উত্তর দিয়ে দিলাম। তিনি অমনি বলে উঠলেন, "একটু long rest এর দরকার। একবার ছুটোর পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো।" বলেই উপরে চলে গেলেন।

দু'তিন দিনের মধ্যেই ছয় মাসের ছুটী মঞ্জুর হ'ল। কোথায় যাব, কিছুই ঠিক নাই। বাক্স, বিছানার পুঁটুলি বেঁধে ষ্টেশন মুখো রওনা দেওয়া গেল। কর্ত্তে যাব বম্বের টিকেট; ক'রে ফেললাম ভুলে হাওড়ার টিকেট। পরদিন সকাল বেলা আবার সেই হাওড়া ষ্টেশন, সেই দলে দলে শীর্ণকায় আমারি দেশবাসী বাঙ্গালী ভাই সব। কুলীর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আবার সেই আঁকা-বাঁকা গ্রামের পথ ধরে চল্‌তে লাগলাম, যে পথে আর কখনো ফিরব না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

ওইত সুমুখে রমেশ বাবুর বাড়ী।...একটীবার যাব কি? ভাব্‌বার আর সময় হ'ল না। একেবারে ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়ীখানা কেমন হতশ্রী, ঠিক পোড়ো বাড়ীর মত। চল্‌তে আমার পা দু'খানি কেবলি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

উঠানটায় দুনিয়ার যত ঘাস ও আবর্জ্জনা। দেখলেই মনে হয় মালক্ষ্মী যেন কতকাল এ বাড়ী ছেড়ে' চ'লে গেছেন। একটী চাক্‌রাণী আবর্জ্জনাগুলোকে ঝেঁটিয়ে জড়ো ক'রে রাখ্‌ছিল, আর নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে কি যেন ব'লে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে দে'খে কেমন যেন একটু বিব্রত হ'য়ে গিয়ে আমার মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রমেশ বাবুর মা দর দালানে ব'সে জপ কচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েই কোন কথাটী না ব'লে চুপ করে তাঁকে একটা প্রণাম করলাম। বৃদ্ধা প্রথমটায় আমাকে চিন্‌তে পারেন নাই। ক্ষণকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে থে'কে ব'লে উঠ্‌লেন 'হিমাংশু না?' ব'লেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মুখ খানাকে আমার চোখের দৃষ্টির সাম্‌নে থে'কে সরিয়ে নিলেন। আমি আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারলাম না। অমনি জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌লাম, "কই কাকেও যে দেখছি নে, এঁরা সব কোথায়।"

রমেশ বাবুর মা বল্লেন, "কাকে দেখ্‌বে? রমেশ আর বৌমা পশ্চিমে বেড়াতে গেছে। আর আমার ভীরুর কথা, জানইত! …বল্লাম—'হাঁ জানি…বিয়ে হয়েছে।'

"হাঁ হয়েছিল বটে!"

"হয়েছিল, তাতে আর দুঃখ কিসের? তার যেমন অদৃষ্ট! এখন কেমন আছে?"

"আর কেমন?…সে কি আছে যে কেমন থাক্‌বে। ভীরু আমাদের মায়া কাটিয়ে সেই দিনই চলে গেছে হিমাংশু!"

'হ্যাঁ কেমন ক'রে সে ম'ল? কি হয়েছিল?"

'বিষ খেয়েছিল!'

পাগলের ন্যায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লাম, 'বিষ কোথায় পেল? কে তাকে দিলে?'

"কে দেবে, দিয়েছে তার নিয়তি। কেউ জান্‌তনা যে, সে এত বড় কাজ করবে। শুধুই যে বাপের মান বাঁচাতে গিয়ে সে নিজের প্রাণ দিয়েছে, এ কথা এখন বেশ বুঝতে পাচ্চি। হাজারই লেখা পড়া গান বাজনা শিখুক, ভীরু আমার ঠিক পাড়া-গাঁয়ের মেয়েরই মতন লাজুক। মনে মনে বিপিনের ওপর তার একটুখানি টান ছিল, কিন্তু সে কখনো মুখ ফুটে কারু কাছে বলেনি। তার বাপকে অপমান করাতেই সে তার উপর চটে যায়। ইদানীং বল্‌ব কি হিমু, তোমাকে পছন্দ করত একটু খানি বেশী। বল্‌তো যে আমাদের চায়ের টেবিলে যতগুলি লোক আসে, এর মধ্যে হিমাংশু বাবুই সবচেয়ে ভদ্রলোক। কিন্তু এর বেশী ত আর কিছুই জানিনে। কেউ কোনো কথা বল্লে মুখ ভার করে থাকত। সেই ৫০০০৲ হাজার টাকার কথাত জানই! হ্যাণ্ড-নোটে টাকা ধার দিয়ে শ্যাম ক্রমাগত ভয় দেখাতে লাগ্‌ল 'সুদ শুদ্ধো টাকা না দিলে নালিশ

কর্‌বে। রমেশ দেখ্‌লে বেগতিক। আগে থেকেই শ্যামের অভিপ্রায় তার জানা ছিল। মেয়েকে এই সম্বন্ধের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তেই, সে মাথা নীচু ক'রে জবাব কর্‌লে, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন বাবা! আপনাদের যা খুসী। এই ত জানি হিমু! কিন্তু এর ভেতরে যে এত খানি কাণ্ড হবে, এ ত স্বপ্নের অগোচর। এখন বুঝতে পাচ্চি এসব ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।···বিয়ের রাতটাও কাট্‌ল না। কখন যে কি হ'ল, কেউ জান্‌তেও পারলে না হিমু! এদিকে সকাল বেলা শয্যা-উত্থান হবে। পাড়ার মেয়েরা এসে কত ডাকাডাকি, কত ঠাট্টা-তামাসা, কত গায়ে ধাক্কা, কত চোখের পাতা ধরে টানা, কিছুতেই কিছু না! মেয়ে-মহলে একটা ভয়ঙ্কর সোর-গোল প'ড়ে গেল—ওগো! এসো, সব দে'খো এ'সে, ভীরা ঘুম থেকে উঠ্‌ছে না কেন?···আর উঠ্‌ছে! তক্ষুনি ডাক্তার এলো, নাড়ী পরীক্ষা হ'ল। কিসের নাড়ী পরীক্ষা?···অমন ফুলের মতন নরম দেহ যেন পাথর হ'য়ে গেছে! মুখ শুঁকে ডাক্তার পেল আফিংয়ের গন্ধ। সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, হিমু সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল!

"আমি কোন রকমে সাম্‌লে গেলাম। কিন্তু মা বাপ হ'ল পাগলের মত!"···বল্‌তেই তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে দু'টী যেন শ্রাবণের ধারা নেমে এল। আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লাম না। সেখান থেকে ছু'টে বেরিয়ে পড়লাম।

*　　　*　　　*　　　*

বেশ আছি। সংসারে কোন ভাবনা চিন্তাই এখন আর নাই। ছিল একজন, সেও গেছে।—আপদ চু'কে গেছে। আর ছিল অফিসের গোলামী, আর টাকা গুলো। গোলামীটাকে বহুদিন আগেই খতম ক'রে ছিলাম। টাকা গুলোকেও সম্প্রতি স্বরাজ-ভাণ্ডারে দিয়ে ফেলেছি।

মুস্কিল আসান

১

মানুষের অশেষ দশা,—কখন ফকির, কখন বাদশা। জানিনে বাদশা কখনো হ'ব কি না। কিন্তু ফকির যে হ'তে বসেছি, এটা নিছক সত্যি কথা। এই ধর না, ছিলাম ভবচন্দ্র ঘোষ, কপালের ফেরে হলাম Bob Gosh কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। বর্ত্তমানে যা হাড়ীর হাল হতে বসেছে, এতে ফকির হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই। তবুও জান কি, পোড়া অহঙ্কারেই সব মাটী করে দেয়। তাইত এমন অবস্থায় পড়েও কারুর সঙ্গে কথা কইতে আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। এইত দেখনা কেন, এদিকে পেটে অন্ন নেই, বলতে কি হাত পা শুদ্ধ ভেতরে ঢুকে যাবার জোগাড়, অথচ মুখে চুরুট ধরিয়ে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে দিব্যি তে-মাথার মোড়ে লাইটপোষ্ট ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজকে দেখাচ্ছি 'কত বড়ই হ'নু'—। কিন্তু এটা যে আমার ওপর নিষ্ঠুর নিয়তির কতখানি ক্রুর পরিহাস, সেটা ভাবতেও অন্ততঃ আমার লজ্জা পাওয়া উচিত। তা পাচ্ছি কি? পেলে হয়ত আমার মাথাটা আপনা আপনিই এই ধূলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়ত। এই যারা সুমুখ দিয়ে চ'লেছে, ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে অন্ততঃ নিমেষের জন্যেও ওদের বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে ওদের খবর-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা ক'রতাম। ওরা যে সব আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। অথচ কেউই আমাকে আর চিন্‌তে পাচ্চেনা। তা যদি পেত, নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে সেই বকেয়া নাম ধরে

আমাকে বল্‌ত 'কিরে ভবা!—কেমন আছিস্?—অনেক দিন তোকে দেখিনি যে!—' কিন্তু সে গুড়েও বালি। নিজেই সব দিক বন্ধ করে ফেলেছি। কেমন ক'রে ফেলেছি, সেই কথাটাই আজ বল্‌তে চাই। কেননা কাল থেকে কোথায় কোন্ কর্ম্ম-সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাব, বল্‌তে পারিনে। কারও ইচ্ছা হয়, শোন নাহয় মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস আছে, আমারও বল্‌বার এখন ফুরসৎ আছে, ভাবনা কি?

আমার ঠাকুরদা ছিলেন গোঁড়া হিঁদু। ঠাকুর দেবতার ওপর যে তাঁর কি অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস ছিল, তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু বাবা হ'য়ে বস্‌লেন ঠিক তার উল্টো। কলকাতায় কলেজে পড়তেন। ব্রাহ্ম-সমাজে ছিল হামেসা যাতায়াত। আচার্য্যদের মুখে অনবরত বক্তৃতা শুনে শুনে পৌত্তলিক উপাসনার ওপর তাঁর কেমন একটা ঘোর অনাস্থা জন্মে গিয়েছিল। তাই যেমনি তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া, অমনি তিনি ঠাকুরদার মন থেকে একেবারে চিরজন্মের মতন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলেন। তাঁর বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও তিনি না হ'য়ে, হলেন গোবিন্দজী। এতে ক'রে ঠাকুরদার হয়ত বা বৈকুণ্ঠ বাসের একটুখানি সুবিধাই হ'য়েছিল। কিন্তু বাবার আমার এত বড় বিরাট পৃথিবীর একটী কোণে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মাথা গুঁজবারও একটুখানি ঠাঁই মেলা মস্ত দায় হ'য়ে পড়ল। বাবা সমাজ থেকে প্রচারের জন্য মাসে ৫০টী করে টাকা পেতেন। তাই দিয়ে কোন রকমে কায়ক্লেশে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে একটা সরু গলিতে একখানা ছোট খোলার ঘর ভাড়া ক'রে মাকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। আমার পূর্ব্বেই দু'টী বোন এসে জন্মাল। মা বাবা দু'জনেরই ঐকান্তিক চেষ্টা হ'ল, কিসে তাদের লেখা-পড়া শিখিয়ে বিদুষী করে তুলবেন। ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয় থেকে সুরু ক'রে বেথুন-কলেজের শেষ পরীক্ষা যখন তাদের শেষ হ'ল,

তখন বাবারও জীবনের প্রায় শেষ। শিক্ষিতা মেয়েরা মা বাবার মুখচেয়ে বেশী দিন আর তাঁদের গলগ্রহ হ'য়ে রইল না। শীঘ্রই তারা পিতা মাতাকে দায়মুক্ত করে দিয়ে নিজেদের ঘরসংসার পেতে নিলে।

কিন্তু মুস্কিলে যা পড়বার তা পড়লাম আমি। বাবা মারা যেতেই আমারও বিদ্যে ওই থার্ডক্লাসে উঠ্‌তেই খতম হ'য়ে গেল। ব্রাহ্ম-সমাজের যাঁরা যাঁরা বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁরা মাকে ও আমাকে কিছুদিন সাহায্য করেছিলেন। শেষে তাঁহাদেরও সাহায্য বন্ধ হ'য়ে গেল। মা-ও হঠাৎ একদিন আমাকে না ব'লে কয়ে বার দু-তিন ভেদ-বমি হওয়াতেই বাবার অনুসরণ করলেন। বাবার পুরান বন্ধুরা দু-চার দিন একটুখানি 'আহা উহু' করে আমাকে ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পেটের ভেতর জ্বলছে কালান্তক আগুন, সে কি শুধু ফাঁকা 'আহা উহুতে' ঠাণ্ডা হবার? কখন পাই, দু'টী খাই, না পাই উপোষ ক'রে দিন কাটিয়ে দিই। এমনি করেই একদিন অনাহারে গঙ্গার ধারে মুখ গুঁজে পড়ে আছি, গঙ্গার শীতল হওয়াতে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল। কখন যে পেটের জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে শ্রান্তিহরা নিদ্রা এসে আমার চোখ দু'টী জুড়ে বসেছিল, সে কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ জাগতেই যেন কার একখানা হাত আমার গায়ে ঠেক্‌ল। চোখ মেলতেই দেখি কি, ইয়া গালপাট্টা, ইয়া মাথায় পাগড়ি—কনেষ্টবল সাহেব। প্রথম সম্ভাষণের সুরুতেই একটা ব্যাটনের খোঁচা না মেরে আর ছাড়লেন না তিনি। তার পরেই গার্ডমে চলো! বলে যেমনি ভাবে আমার দিকে কৃপা দৃষ্টিপাত করলেন, তাতে আমার আর কোন উচ্চবাচ্য করবার ফুরসৎ হল না। সে নয়নাভিরাম মূর্ত্তির সাম্‌নে স্বয়ং যমরাজকেও হয়ত ভয়ে ঘাব্‌ড়ে যেতে হত। হায়রে মিছেই কেবল দু-তিনবার পকেট হাঁটকালাম। সে উপায়ই যদি থাক্‌বে ত শাস্ত্রী সাহেবের শ্রীহস্তে পড়েই বা অমন নাকাল হব কেন?

আমার ওপর ট্রেসপাসের চার্জ এল। হয় ২৫৲ টাকা জরিমানা নয় ১ মাস শ্রীঘর বাস। হঠাৎ তখন Nonviolent Non-Cooperator হ'য়ে পড়া গেল। মহাত্মাজীর নাম তখনও দেশময় এমন করে ছড়িয়ে পড়েনি। তা হ'লে ভালই হ'ত। তাঁর পবিত্র নাম কীর্ত্তন করে শ্রীঘরে আরও অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য খোরপোষের বন্দোবস্ত করে নেওয়া যেত।

এক মাস পরে একদিন সকালবেলা জেল-সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট সাহেবকে লম্বা সেলাম ঠুকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে দেখি কি কতকগুলো স্বদেশী সাবান ও গেঞ্জি মাথায় করে ফেরি করে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম রোজ তার ১৲—৷৷৹ টাকা লাভ হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মাথায় ক'রে বোঝা বয়ে রাস্তায় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে বেড়ানো ত দায়। ওর চাইতে চাকুরী করায় ঢের সম্মান আছে—বলেই, বন্ধুর দিকে নাকটাকে উঁচু করে তুলে মুখখানাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলাম।

মাসখানেক একরকম করে কাটিয়ে দেওয়া গেল। বুঝতেই পার ত 'ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে'। কিন্তু বেশীদিন কি আর এভাবে চলে? মাথায় করে মোট বয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করলে মানহানি হয়, কিন্তু পরের কাছে হাত পাতলে হয় না। হায়রে! সনাতন দেশের সনাতন প্রথা। কিন্তু এটা যে একটা কুপ্রথা, তা তখনো আমার মাথায় ঢোকেনি। পেটে টান পড়ে, আর পরের কাছে হাত পাতি। হঠাৎ একদিন একটী বাবু আমার দিকে এমনি ভাবে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যে, তাতে যদি আত্মসম্মানের জ্ঞান এতটুকুও আমার থেকে থাকৃত, ত সেটা যেন সেদিন বেশ উপলব্ধি করলাম। ফিরে এলাম সেখান থেকে। কিন্তু অভিমান নিয়ে এসেই বা কি কোরবো? কি করবার মুরদ আছে আমার?

জানিনে, নিজের জীবনের ওপর কেমন একটা ঘৃণা জন্মে গেল। মনে মনে ঠিক করলাম, ও রাস্তায় আর না! এতে যা থাকে অদৃষ্টে। এই না ভেবে যে রাস্তাটা সাম্‌নে পেলাম, তাই ধ'রে চল্‌তে লাগলাম, কোনো দিকেই লক্ষ্য না রেখে। হুস্ হুস্ শব্দে আশ পাশ দিয়ে কত হাওয়ার গাড়ী ছুটে চলেছে,—কত বড় বড় ব্রুহাম গাড়ী টগ্‌বগ্ ক'রে, মাঝে মাঝে টুং টাং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে সাড়া দিয়ে চলেছে। আমার সে সব দিকে লক্ষ্যই নেই। হঠাৎ যাবিত যা, একখানা হাওয়ার গাড়ী প্রায় আমার গায়ের ওপর দিয়েই চলে গেল। অমনি হুড় মুড় ক'রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম। যেতেই গাড়ী থেকে একটা রাঙ্গা-মুখো সাহেব ধড়মড় ক'রে নেমে পড়লেন। তখুনি তাড়াতাড়ি ক'রে আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে গা, মাথার ধূলো ঝেড়ে ফেলে হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন "ছোকরা! টুমারা কিধার চোট্ লাগা হ্যায়?" কাঁদ কাঁদ স্বরে জবাব কর্‌লাম—'আর চোটের কথা বোল্‌তা হ্যায় সাহেব? দেখ্‌তেই ত পাতা, একদম গাড়ীর নীচে পড়া গিয়া হ্যায়।'

'আগাড়ি কাহে হুঁসিয়ার নেহি হুয়া?'

'আর হুঁসিয়ার সাহেব। কপাল একদম মন্দ হ্যায় সাহেব, তাইত পড়া গিয়া।'

'টোমারা কোই হ্যায়? মা বাবা জিটা হ্যায়?'

এবারে আরও কান্না পেল। চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লাম 'কেউ নেহি হ্যায় সাহেব?'

বল্‌ব কি, সাহেব আমার এই অদ্ভুত হিন্দী কথা আগাগোড়াই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে।—আর যায় কোথায়? সাহেব ত একেবারে গলে জল। তখুনি আমার পিঠে হাত চাপড়ে বল্‌লে 'চলো হামারা গাড়ীমে।'

নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠে পড়লাম। গাড়ীতে চল্‌তে চল্‌তে সাহেব

আমাকে অনেক রকম আশা দিয়ে বুঝিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, যে আমাদের মঙ্গলের জন্যেই নাকি সাত সুমুদ্দুর তের নদী ডিঙ্গিয়ে ওঁদের এই বর্ব্বর দেশে আগমন। আঃ! সেই রাঙ্গা-মুখের কথাগুলি কি মিষ্টিই লাগছিল তখন, যে তা' আর ব'লে শেষ করতে পারিনে। এরপর তিন দিন ··আঃ কি মহা আরামেই কেটে গেল!

চার দিনের দিন বল্‌ব কি সাহেবের কি অপার করুণা! আমাকে সঙ্গে করে অনেক রাস্তা বেড়িয়ে শেয়ালদ' রেল-ষ্টেশনে এসে হাজির। তারপর টিকেট ক'রে আমাকে নিয়ে সটান গোয়ালন্দ মেলে যাত্রা। ভোর ভোর সময়টায় গোয়ালন্দ ঘাটে ট্রেণ পৌঁছতেই, আর মুহূর্ত্তেরও বিলম্ব সইল না। R. S. N. COর ষ্টীমার তখন ছাড়ে ছাড়ে, আমাকে হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টান্‌তে টান্‌তে একেবারে ষ্টীমারে গিয়ে চাপলেন। আমি একটুখানি ঘাবড়েই গিয়েছিলুম। সাহেব সেটা লক্ষ্য ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে ফেলে বল্‌লেন 'কভি ঘাবড়ো মাত্‌—। হামারা সাথ যানেসে মুস্কিল আসান হোয়ে গা।' বল্‌লাম 'মুস্কিল আসান' যে হোয়ে গা ওত বহুৎই মালুম হোতা হ্যায় সাহেব। হাড়ে হাড়ে একদম টের পাতা হ্যায় সাহেব।' সাহেব আমার কথায় মনে মনে বোধ হয় খুসীই হ'ল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে হাসি হাসি মুখে সেখান থেকে গিয়ে তার কেবিনে ঢুকে পড়্‌ল। আমিও কথাটী না বলে চুপ করে পদ্মার ঢেউ দেখ্‌তে লাগলুম।

২

সাতদিনের দিন ডিব্রুগড় গিয়ে পৌঁছলুম। এ সাত দিন, কখন আশায় কখন বা নৈরাশ্যে কেটে গেছে। হয়ত চুপ করে জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে আছি, এমন সময় সাহেব এসে জিজ্ঞাসা করেছে—'কেয়া করতা হ্যায়?' বিরক্ত হয়ে খাস বাংলায় উত্তর করেছি, 'জলের ঢেউ গুণ্‌ছি সাহেব।' তখন মনে মনে হয়ত বলেছি, 'করচি তোমার গুষ্টীর মাথা আর মুণ্ডু।' সাহেব আমার জবাব শুনে, জানিনে বুঝতে পারত কিনা, কোনো কথাটী না বলে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যেত। খাবার-দাবারের বন্দোবস্তও আমার জন্যে সে খুবই করত। কিন্তু সাহেব যে জন্যে আমাকে এত আশা ভরসা দিয়ে এনেছিল সেই 'মুস্কিল আসানের' দেশে পৌঁছতেই দেখি কি তার অপার করুণায় আমি তোফা চা-বাগানের কুলীগিরীতে ভর্ত্তি হয়ে গেছি। সাহেব মনিব, আমি তার অধীন কুলী হায় রে! আজ আর আমার অভিমানে ঘা লাগল না। এর চেয়ে—মোট ব'য়ে বেড়ালে যে শতগুণে ভাল ছিল।

আমার মনিবের ধারণা ছিল, আমি বুঝি লেখাপড়ায় একেবারে বকলম। কিন্তু যেদিন হঠাৎ আমার মুখে কি একটা ইংরেজী কথা শুনতে পেলেন, সেদিন ত তাঁর আর বিস্ময়ের অবধিই রইল না। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে একটুখানি খোস্ মেজাজে জিজ্ঞাসা করলেন, টোম ইংলেশ জানটা হ্যায়?......

একটা লম্বা সেলাম ঠুকে জবাব করলুম—থোড়া কুছ জানতাহ্যায় সাহেব। সুতরাং আমার হিন্দীরও আগের চেয়ে উন্নতি দেখে এবং

ইংরেজীতেও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সাহেব যে খুবই খুসী হলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন যে অচিরেই অর্থাৎ বছর খানেকের মধ্যেই আমার কুলীগিরি থেকে দুর্লভ কেরাণী গিরিতে প্রমোশন দেবেন।

একেবারে যেন পশু-জন্ম থেকে দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ, বেঁচে থাক্ সাহেবের যে যেখানে আছে,—মনে মনে বলেই তখনকার মত একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে দুঃখময় কুলী-জীবনের ভারটাকে একটুখানি হাল্‌কা করে নিলুম।

কিন্তু সময় কারো মুখ চেয়ে বসে থাকবে না—কুলীর কাজই করি আর সাহেবের পিয়ারের নোকর হয়ে তার সাথে সাথে ফিরি। সাহেবে সাহেবে হরদম্ ইংরেজী বুলির তুবড়ি ছুট্‌তে থাকে। শুনে শুনে কাণটা একটুখানি দোরস্ত করে নিলুম। আর যখনি একা থাকবার এতটুকু ফুরসৎ পেতাম অমনি সাহেবের মতন অদ্ভুত কায়দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিক্ ফিক্ করে মাথা মুণ্ডু কত কি বকে যেতাম, আর মনে মনে হাস্‌তাম এই ভেবে, যে আর গোটাকয়েক মাস কেটে গেলেই আমারও কুলীজীবন ঘুচে গিয়ে কেরাণী-জীবন লাভ হবে,—তখন আর আমাকে পায় কে? তখন আমিও বড় সাহেবের চেয়ে ত একজন কম-সম সাহেব হবনা। তখন ওই ড্যাম নিগার নেটিভ কুলীগুলোকে দু'দিনেই কায়দায় আন্‌তে পারবো।

কিন্তু আমার কপাল! বছরও ঘুরে গেল,—আমার সাহেবেরও এমন একটা জায়গা থেকে তলপ এল, যেখানে তিনি আর না গিয়ে পারলেন না। নতুন মনিব এলেন খাস বিলেত থেকে। যেমনি আগুনের মতো তাঁর লাল টকটকে চেহারা, তেমনি আগুনের মতোই মেজাজ। সাহেবের শুভাগমনের কিছুদিন পরেই তাঁর একটী বাহন এসে জুটল। নাম গোমেশ, ধাম কলকাতার চুনোগলি। চেহারা? সে কথা আর

ব'লে দরকার নেই। মোটের ওপর কালো পোষাকের ভেতর থেকে তাকে চিনে বার করা শক্ত হ'য়ে পড়ত। এই গোমেশই হ'ল নতুন মনিবের কেরাণী। হায়রে! আমার কপালই যদি মন্দ না হবে ত, আমার মুখের গ্রাস আরএকজন এসে কেড়ে নেবে কেন? গোমেশের ওপর মনে মনে যতই খাপ্পা হই না কেন, সে বেচারার দোষটা কি? দু'চারদিনেই আলাপটা একটুখানি পাকিয়ে নিতেই সেও আমার ওপরে ভারী খুসী হ'য়ে গেল। একদিন তাকে আমার দুঃখের কাহিনী বল্‌তেই, সে একেবারে গলে জল। বল্‌লে, পিক্রু ব'লে তার এক মেসো কলকাতা ম্যাকিনটশ কোম্পানীর ওয়ার্কসপে কাজ করে। তার ভাইয়ের বরাবর এক চিঠি দিয়ে সেই সঙ্গে পিক্রুকেও এক সুপারিশী চিঠি দেবে। আরও বল্‌লে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় না দিতে পারলে চাকরী হবে না। 'বহুৎ আচ্ছা! ছিলাম ভবচন্দ্র ঘোষ, হলাম Bob Gosh। দরকার হলে আরও কতবার নাম বদলাব,—কত নূতন নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে নব জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করব, তবে ত!

সেই দিন রাত্রেই গোমেশের চিঠি নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপে চুপে ষ্টীমারে চড়ে দেশ মুখো রওনা দিলুম। আবার সেই কলকাতা, সেই সব লোকজন, সেই গাড়ী ঘোড়ার বহর, সেই জীবন যাত্রার পথে অবিশ্রান্ত লড়াই। বহু কষ্টে ভিড় ঠেলে কত গলি-ঘুঁজি ঘুরে ফিরে গোমেশের চিঠি নিয়ে তাদের চুনো-গলির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম।

গোমেশের ভাইয়ের চিঠিখানা তাকে দিয়ে মুখেও দু'চার কথা বলে তার মনটা একটুখানি পরখ করে নিলুম। দেখতে পেলুম, ভাইটীও ঠিক দাদারই মত। চিরপরিচিতের মতনই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে একটু চা খাবার দিয়ে ও আদর না করে ছাড়লে না। চা পান শেষ হতেই

আমাক বল্লে Never mind come on man ! বলেই আমাকে বার বার সাবধান করে দিলে, বাঙ্গালী বলে পরিচয় না দিতে। তারপর চাঁদনীতে এক পুরানো পোষাকের দোকানে ঢুকে সাহেবীসুট একটা কিনে ফেলে তখুনি বিদঘুটে সাহেব সেজে বস্‌লাম। অবশেষে এক Hair dressing Saloonএ ঢুকে চুলটাকে মাথার চামড়া বের করে অদ্ভুত ফ্যাসানে ছাঁটাই করা গেল। গোঁফ জোড়াটাও হুবহু চ্যাপ্‌লিন প্যাটার্ণের হল। পয়সা দশেক দামের একজোড়া নীলরঙের কাঁচের ঠুলিও চোখে উঠ্‌ল। সস্তায় চুরুট তখন পয়সায় চারটে করে। তারই আধপয়সার না কিনে দু'জনে দুটো ধরিয়ে সটান বুক ফুলিয়ে ম্যাকিন্‌টশ কোম্পানীর আফিস মুখো রওনা দিলুম।

বন্ধুর কৃপায় নিজে পূর্ব্বেই ভবঘোষ থেকে প্রমোশন পেয়ে Bob Gosh হয়ে ছিলাম, এবারে স্বর্গীয় পিতৃদেবকে করলাম হরি-ঘোষ থেকে Harry Gosh !! বন্ধুর মেসো পিক্র ছিল আফিসের Sub-manager, বলা বাহুল্য বন্ধুর নানারকম সুপারিশীর জোরেই তার মেসোর প্রসাদে একদম Time-keeper এর দুর্ল্লভ চাকুরীতে বাহাল হয়ে গেলুম। হয়েই এমনি পুরোদমে সাহেবী চাল চালাতে সুরু করলুম, যে আমার নীচেকার মজুররা ত একেবারে ভয়েই তটস্থ। সকাল সাতটা ও দুপুরের একটার হাজিরায় একটুখানি কারো দেরী হলেই আর রক্ষা নেই। অমনি তাকে গরহাজির করে বসি। কিন্তু সনাতন মিস্ত্রীটে এমনি সেয়ানা লোক যে তাকে আর কিছুতেই পেরে ওঠা যেত না। সে সময় সময় আমাকে শুনিয়ে পরিষ্কার শাদা বাংলায় বল্‌ত, "আমাদের হকের কামাই,—এ যদি না হক করে কোন ব্যাটা মারে ত তাকে মারবেন ভগবান নিজে। আরে স্যাঙ্গাৎ! তুমিও যেমন, কত ব্যাটাকেই দেখ্‌লুম এই টুলের ওপর বসে লাট সায়েবী করতে। দেখতে দেখতে মাথার চুল সব ক'গাছাই ত শাদা

হয়ে গেল। কিন্তু যে সনাতন, সেই সনাতনই ত রয়ে গেছি। জ্বাখাই যাক্ না, এ গুয়োটারই বা বিদ্যের দৌড় কদ্দুর।" এই রকম আমার সাক্ষাতে অসাক্ষাতে যে কত প্রকারের গালি গালাজই সে আমার উপর বর্ষণ করত, তা আর বলে শেষ করা যায় না! দিন দিন তার সঙ্গে আর সকলেও বেশ সায় দিতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে লোকগুলো বাইরে যতই বাধ্য হোক ভেতরে ভেতরে ঠিক তেমন নয়। সুযোগ পেলেই যে সুদ শুদ্ধো আমার এই ব্যবহার কড়ায় গণ্ডায় এরা আমাকে চুকিয়ে দিতে পারে, সে বিষয়ে আর এতটুকুও ভুল নেই।

বুঝতে পারলুম, এ একটা নূতন জাগরণ, একটা নূতন প্রাণের স্পন্দন। এমন কোনো শক্তি নেই, যা একে বাধা দিতে পারে। হঠাৎ কোথা থেকে যে কেমন ক'রে একটা ঢেউ এসে সারা দেশটার ওপর দিয়ে চলে গেল, তা বোঝা গেল না। কিন্তু যে দিন দেখা গেল, যে যারা এতদিন বোবার মতন চুপ করে আমাদের হুকুম মেনে কাজ করে গেছে, সেই সব নিরক্ষরদের মুখেও কথা ফুটেছে, সেদিন ব্যাপারটা বুঝতে বড় বাকী রইল না। দেখা গেল, আমার মতন পেঁচি সাহেব ত দূরের কথা, আমাদের এঞ্জিনিয়ার সাহেবকেও বড় একটা গ্রাহ্য করে না। একদিন সাহেবের ওপর রাগ করে জোট বেঁধে কতকগুলো লোক চাকরী ছেড়ে গেল। আমারি অবস্থা হয়ে পড়ল দিন কে দিন সঙ্গীন। যদিই আফিসে কোনো রকম Reduction হয়ত আমার চাকরী গিয়ে রয়েছে সবার আগে।

ভেবে আর কূল-কিনারা পাইনে। এদিকে খুব জোরসে স্বদেশী চল্‌তেই অনেকগুলো বিদেশী কল কারখানা বন্ধ হবার জোগাড় হয়ে উঠ্‌লো। আমাদের কারখানায় যাদের Reductionএ ক্ষতি হবার কথা, তাদের অনেকেই আগে থেকে সরে পড়েছিল। যারা ছিল, তাদের কদর কত?

সনাতন তাদের সরদার। সুতরাং আমার যে স্থান কোথায় তা সহজেই বোঝা যায়।

বেলা ৯টা আন্দাজ হবে। সাহেবের বকুনি খেয়ে মেজাজটা তেমন ভাল ছিলনা। হঠাৎ কি একটা কাজে সনাতনের ওপর চঠে উঠে যেম্‌নি তাকে বলে বসেছি, Dam it. I don't care you নিকাল যাও হিঁয়াসে উল্লু! বল্‌তেই সে খাঁটী-বাংলায় ও হিন্দীতে আমাকে আমার পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ করে যা গালিগালাজ পাড়লে, তাতে স্বর্গ-লোকে থেকেও যে আমার পিতা-মাতার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল একথা আমি শপথ করে বল্‌তে পারি।

ব্যাপারটা সেদিন আর বেশীদূর গড়ালনা। পরের দিন দেখি কি আমার পকেটের চিঠিগুলো নিরুদ্দেশ।

হঠাৎ বুকটার ভিতর দুর দুর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। সর্ব্বনাশ। এর ভেতরকার যে বেশীগুলোই বাংলা চিঠি। বেশীক্ষণ যে একটু খুঁজে খুঁজে দেখবো, সে অবসরও হয়ে উঠলোনা। অমনি সাহেবের কাছ থেকে তলপ এল। বাইরে থেকেই সনাতন মিস্ত্রীর গলা শুন্‌তে পেলুম। সে পরিষ্কার বাংলায় বল্‌ছে—"আজ্ঞে হুজুর! তাহ'লে আর ভাবনা ছেলো কিসের? ও আদতে হ'ল কফ্রীরও ওস্তা। বল্‌ব কি হুজুর, জাতে বাঙ্গালী, এখন নাম ধাম, এমনকি বাবার নাম অবধি ভাঁড়িয়ে সায়েব হ'য়ে বসেছে। হুজুর আমাদেরত দিনরাত এই ভয়, যে কোনো জেলফেরৎ-টেরৎ না হয়।"

বড় সাহেবও পরিষ্কার হিন্দী মেশানো বাংলায় জবাব করছেন, "আচ্ছা এখন মুকাবিলা হলে বিলকুল মালুম হয়ে যাবে। আচ্ছা জল্‌দি বোলাও ওস্কো।" সাহেবের এই প্রভুত্বব্যঞ্জক উক্তি আমার কাণে পৌঁছতেই বুকটার ভেতর কেবলি ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।...

·· কতক্ষণ পরে যে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তা মনে নেই।

অনেক চিন্তার পর মনে হলো, সাহেব আমার মাইনে পত্র চুকিয়ে দিয়ে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে আমাকে জবাব দিয়েছে।

পরদিন বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে।…তারপর আজ দুইমাস কেবলি পথে পথে ঘুরছি। আর ত উপায় নেই। হতচ্ছাড়া গোমেশটাকে যদি আজ পেতুম ত, গলা টিপে এই নদীর জলে চুবিয়ে মারতুম,—না হয় তাতে ফাঁসি যেতুম। তাতেও আমার এতটুকু দুঃখু ছিলনা। কি করি? একূলও গেল—ওকূলও গেল। ওই যে দলে দলে সব আমার সুমুখ দিয়ে চলেছে, ওরা যে সব আমার দেশ-ভাই। ওদের অনেকের সঙ্গেই যে আমার কত ভাব ছিল। এখন আর আমাকে দেখে কেউই চিন্‌তে পারছেনা। হায় হায়। চিনবার সকল পথ যে আমিই বন্ধ ক'রে ফে'লেছি। না—আর না। ওই যে সব মুটে-মজুর চলেছে,—কি স্ফূর্ত্তিই ওদের চোখে মুখে। কি একটা বিরাট প্রাণের স্পন্দনই পাওয়া যাচ্ছে আজ ওদের বুকে। …না না ঢের হয়েছে! দুত্তোর সায়েবী টুপি। দুত্তোর বিলিতী চুরুট্। এই ফিরিঙ্গীয়ানাই আমাকে মাটী করে ফেলেছে, আমাকে দেশ মায়ের কোল থে'কে দেশ ভায়ের বাহু পাশ থেকে ছিট্‌কিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে পাপের অতল পঙ্কে টেনে ফেলেছে। এবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে এ পাপের। ওই যে সব স্রোতের মত চলেছে মহাত্মাজীর জয় গান করে। যাই—ওদের ওই স্রোতে গিয়ে গা ভাসিয়ে দিই। দেখি তাতে যদি পাপের এতটুকুও লাঘব হয়, জীবন ব্যাপী মুস্কিলের আসান হয়।…আঃ। কি মেঘ-গম্ভীর স্বরেই হেঁকে হেঁকে সব বল্‌তে বল্‌তে চলেছে "জয় মহাত্মাজী কিজয়।"…কি আরাম·· কি শান্তি!!!

বাড়ী-বদল

১

একরত্তি মেয়ে, তার আবার রকম দেখ না। তিনবার না ডাক্‌লে কথার জবাব নেই, পয়সাটী দিলে কখনো ভুল ক্রমেও ডান হাত দিয়ে নেবে না, অমনি দেবে বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে। তক্ষুনি ইচ্ছে করে মারি গালে ক'সে এক থাপ্পড়, না হয় দিই ওর বাঁ হাতখানা এক মোচড়ে ভেঙ্গে ফেলে। তবু ত কাঠ বেচুনীর মেয়ে, নেহাৎ ছোট জাত, গায়ের কাছে ঘেঁস্‌তেই গা টা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ কর্‌তে থাকে। একটু খানি উঁচু ঘরের হ'লে আর ছুঁড়ীটার মাটীতে পাই পড়ত না মনে হয়।

২

আমাদেরি বাসার সাম্‌নে তাদের বাসা। অনেক গুলো এক সঙ্গে থাকে। দিনরাত তাদের কিল্‌বিলিতে কার সাধ্যি যে, চোখের দু'পাতা একত্র করে। পুরুষ গুলো সারাদিন হয় কুলীর কাজ করে, নয় রাস্তার আবর্জ্জনা সাফ করে, সন্ধ্যার সময় হয় সস্তার চুরুট মুখে পূ'রে রাস্তার ব'সে জটলা করে, নয় রাস্তার ওপরই যা তা একটা কিছু পেতে শু'য়ে পড়ে। তারা পায়ে ঘুঙ্গুর পরে কাঠের করতালি নিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান গেয়ে রাত বারোটা একটা অবধি কাটিয়ে দেয়। পুলিশের তেমন কড়াক্কড় আইন কানুন থাক্‌লে এটি আর হবার যো থাকৃত না। নাই, তাই

রক্ষে। ফলে পাড়ার লোকের যে খুবই ঘুমের ব্যাঘাত হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই মেয়েটী যে ঘরের বাসিন্দা, সে ঘরে একটি বুড়ো, একটী বুড়ী ও একটি জোয়ান ছোকরা থাকে, এরা সম্পর্কে এর বাপ, মা এবং ভাই। বুড়োটার কাজের মধ্যে ছোট্ট একখানা নেংটী প'রে সারাদিন দরজার কাছে ব'সে সস্তা দামের চুরুট ধ্বংস করা, বুড়ী ও ছেলেটার কাজ গাড়ী বোঝাই করে কাঠ-গুদাম থেকে চেরাই করা কাঠের অকেজো টুক্‌রো গুলি স্বল্প-মূল্যে কিনে এনে ছোট্ট ছোট্ট টুক্‌রো করে বিক্রী করা, এবং আমের দিনে কাঁচা আম কিনে সে গুলি থেকে আচার তৈরী ক'রে জালা. মটকী ভ'রে রাখা, সারা বছরের বিক্রীর জন্যে, তাতে লাভও বিস্তর। এ ছাড়া সস্তার চুরুট বিক্রী ত আছেই। মোটের উপর এই ছোট খাটো ব্যবসাটুকু মন্দ নয়।

আমার এদের সঙ্গে পরিচয় কাঠ কেনার সম্পর্কেই। যে দিনই কাঠ কিন্‌তে যাই, সেই দিনই এই কালো চেহারার একরত্তি মেয়েটীর কাছে এমন ব্যবহার পাই যে তা আর কি বোল্‌ব। কেবলি মনে হতে থাকে, না আর এ হতচ্ছাড়ীর কাছ থেকে কাঠ কিন্‌বো না। কিন্তু না কিনেও ত উপায় নাই। এখান থেকে কাঠ না কিন্‌লে কাছে-কিনারে আর দোকান নাই, একেবারে ওই গলির ও মোড়ে। না অতদুর থেকে কাঠ ব'য়ে আনা কি সোজা কথা? যাক্‌গে, মরুক্‌গে, কোথাকার কে, ওর ওপর রাগ ক'রে মিছেমিছি নিজের কষ্ট বাড়াই কেন? কাঠ কেনা ত শুধু, পয়সাটা ফেলে দেবো আঁটিটা হাতে করে তুলে নিয়ে আস্‌বো তা ওর ডান হাত বাঁ হাতের বিচার করে আমার কি লাভ? চুলোয় যাক্‌গে যত সব সেন্টিমেণ্ট।



সকাল-বেলা থেকেই খুব বৃষ্টি। বাজার থেকে ফেরবার মুখেই মনে কর্‌লাম এই সকালবেলা একবারটি ত শেয়াল ভেজা হ'লাম, আবারটী যাতে না হতে হয় তাই করা যাক্ না। কাঠটা এখন নিয়ে গেলে ক্ষতি কি! মনে করেই যেমনি হাত বাড়িয়ে পয়সাটী দিয়েছি কি, অম্‌নি মেয়েটি বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে পয়সাটী নিলে, জলে ভিজে ভিজে আমারও মেজাজটা কেমন বিশ্রী হ'য়ে গেছ্‌ল, তৎক্ষণাৎ করলাম কি, কাঠের আঁটিটা না নিজের হাতে তুলে নিয়ে মার্‌লাম ঠুক্ করে তার বাঁ হাতে এক ঘা, মুখেও বল্‌লাম—'ভ্যাখ লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, বেয়াদবীর কি ফল।' বাপরে! ওইত ঘটনা, এইতেই সে এম্‌নি ভাবে একটা বিকট চীৎকার দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌ল যে আমি ত দেখেই অবাক্। অম্‌নি হাঁ হাঁ ক'রে তার মা ছুটে এল, বুড়ো ছুটে এল। আমি তাদের কাছে অবস্থা বুঝিয়ে বল্‌তেই আমি ত রেহাই পেলাম; কিন্তু মেয়েটাকে তার মা আর আস্ত রাখলে না। ওঃ সে কি বেদম মার। একবার ইচ্ছা করতে লাগল, ছুটে গিয়ে বুড়ীকে থামিয়ে দিই। কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠল না। ঘরে এসেই নিজের ভিজা কাপড়-চোপড় তৎক্ষণাৎ ছেড়ে ফেলতে হল।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে সাম্‌নের জানালার কাছে গিয়ে বসে চোখ দু'টী কেবল তাদের ঘরের দোর গোড়ায় ফেলে রাখলাম। দেখি কি, মেয়েটা কাপড় চোপড় গায়ে জড়িয়ে সেখানটায় তেমনি ভাবে চুপ ক'রে ব'সে আছে। হঠাৎ একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ দু'টী নামিয়ে নিলে। ওইতেই দেখলাম, তার চোখ দু'টী জলে ভরা, চাউনিটী ব্যথা-কাতর তিরস্কার মিশ্রিত। আমি আর সে দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতে পারলাম না। তার

একটী মাত্র চাউনিতেই আমার পিঠে যেন থেকে থেকে কেবলি লগুড়ের ঘা পড়তে লাগল। একবার ভাবলাম, যাই মেয়েটাকে গিয়ে মিষ্ট কথায়, না হয় মিষ্ট খাবার-টাবার একটা কিছু কিনে দিয়ে খুসী ক'রে আসি। কিন্তু আবার ভাবলাম থাক্‌গে, আমি ত আর ওর কাছে কোনো অপরাধ করিনি। ওই ওর নিজের দোষে মার খেয়েছে তা আমি কি কোরব। থাক্ থাক্, এখন থেকে একটু শাসন হওয়া ভাল নইলে মেয়েটা ভারী দজ্জাল হবে।

৪

আফিসে যেতে একটু দেরীই হয়ে গেল। গিয়েই দেখি সুপারিন্-টেন্‌ডেণ্ট মশাই দয়া ক'রে আমার সই করবার ঘরে লাল-কালীতে একটা মস্ত ঢেরা সই মেরে রেখেছেন। টাইমটা মার্ক ক'রে ওরই একপাশে কোন রকমে সই ক'রে চাকুরীটা আগে বজায় রাখি, তার পর সনাতন কাজ-কর্ম্ম আছে, আর আমি আছি।

কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও সেদিন অফিসের কাজে মন বসাতে পারলাম না। মনটা কেবলি ঘুরে ফিরে সেই মেয়েটির কাছে আনাগোনা কর্‌তে লাগল, আর তার সেই জল ভরা চোখের ব্যথিত চাউনির সাম্‌নে টিঁক্‌তে না পেরে ফিরে ফিরে এসে বুকের ভেতর ঘা মার্‌তে লাগল।

কেমনি যেন একটা ঘোর অস্বস্তি নিয়ে অফিসের ঘণ্টা ক'টী কেবল ছট্‌ফট্ করে কাটিয়ে দিতে লাগলাম। জানি না কাজের গাফেলীর দরুণ যদি ওই বনাত মোড়া বড় টেবিলটার ওপাশ থেকে কৈফিয়ৎ আসে ত মুস্কিল। যে শ্যেন্-দৃষ্টি ওই চশমার ভিতর দিয়ে চারিদিকে ঘোরা-ফেরা কর্‌ছে, এতে কিছুই আশ্চর্য্যি নয়। কিন্তু কেন জানি না, ভাগ্য আজকার

বড়ই সুপ্রসন্ন দেখা গেল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব কি একটা বড় রকমের কেস্‌ নিয়ে প'ড়েছিলেন, সারাটী দিন এক রকম তারই মধ্যে ডুবে রইলেন। দু একবার কৃপাদৃষ্টি যা আমাদের দিকে নিক্ষেপ কর্‌লেন, তাও কতকটা অন্য-মনস্কের মত। আমিও কতকটা অন্য-মনস্কের মতই সাড়ে চারটা বাজতে না বাজতেই উঠে পড়্‌লাম।

বাসার কাছে আস্‌তেই দেখি কি সাম্‌নের সেই ঘরটার দরজা ভেজানো। রোজ ত এম্‌নি করে দরজা ভেজানো থাকে না! মনটা আবার ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ কর্‌তে লাগল। বাসায় জিজ্ঞাসা করেও কোনো খবর জানতে পার্‌লাম না। ঘরে এমন একটা লোক নাই। যে পাঠিয়ে দিয়ে খবরটা নিয়ে আসি। যাক্‌গে ওরা কে আমার যে ওদের জন্যে আমার এত মাথা-ব্যথা! দুত্তোর! হাত মুখ ধু'য়ে চা-টা খেয়ে একটু গড়াইগে।



কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে,—স্বপ্নে কি না তাও বল্‌তে পারিনে, একটা চাপা-কান্না যেন ক্রমাগত আমার কাণে এসে বাজছিল, ধড় মড় করে উঠেই জানলার কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, দরজাটা একটু খানি খোলা,—ভিতরে মেয়েটা যা-তা দিয়ে তৈরী একটা বিছানার উপর বেহুঁস অবস্থায় শুয়ে পড়ে আছে,—মা বেচারী তার মাথায় হাত বুলুচ্ছে, আর ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। স্তম্ভিতের মতন ক্ষণকাল সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর তিষ্ঠাতে পারলাম না। একখানা কম্বল ও থারমোমিটারটী নিয়ে তক্ষুনি ছুটে নীচেয় নেমে গেলাম।

ভিতরে ঢুক্‌তেই মা বেচারী আমাকে দেখে একটু খানি ভড়্‌কে

গেল। শেষে যখন আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম—ভয় নেই, আমি তোমার মেয়েকে দেখতে এসেছি, তখন যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেল। মেয়েটার কপালে হাত দিয়েই বুঝ্‌লাম জ্বর খুব বেশী। জ্বরের তাতে সারাগায়ে খই ফুট্‌ছে। তাড়াতাড়ি করে থারমোমিটারটার পারা নামিয়ে বগলে দিতেই দেখি, পারা ১০৪ ডিগ্রীতে পৌঁচেছে। চোখের পাতা টেনে দেখি কি, চোখ জবা-ফুলের মতন লাল টক্‌টকে। ভয়ে ভয়ে মা বেচারী জিজ্ঞেস্ করলে 'বাবু! কেমন দেখ্‌লে?' হঠাৎ কথাটার জবাব দিতে গিয়ে থত মত খেয়ে গেলাম। পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লাম, ভয় নেই, শাদা জ্বর, ২।১ দিনেই ভাল হয়ে যাবে। বলেই তার বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম বরফ আন্‌তে। বরফের কথা শুনেই মা আমার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌লো—'বাবু! এই ঠাণ্ডা রাতে বরফ দিয়ে কি হবে? আমার মেয়েটাকে আর ঠাণ্ডা লাগিয়ে মেরো না।'

তার কথা তখন কে শোনে? আমিও তৎক্ষণাৎ এক খানা গাড়ী করে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আধ-ঘণ্টা পরে ডাক্তার নিয়ে এসে হাজির হতেই মা বেচারী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে—'তবে না বাবু শাদা জ্বর বলেছিলে? এখন দেখছি ডাক্তার এনেচ?' নিতান্ত অপরাধীর মতন জবাব করলাম, 'শাদা জ্বর বলেই কি ডাক্তার লাগে না? তোমাদের কোনো ভয় নেই, যা কর্ত্তে হয় আমিই কর্চ্ছি।'

৬

যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। ডাক্তারও পরীক্ষা করে বললেন—প্লেগ।

প্লে—গ্! বলেন কি ডাক্তার বাবু? আমি যে ওর মা-বেচারিকে সাহস দিয়ে বলছি শাদা জ্বর' ২।১ দিনেই সেরে যাবে।

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার বল্‌লেন, 'কি করবেন—উপায় ত নাই। যতদূর মনে হচ্ছে septic টাইপের। তবু যতক্ষণ শ্বাস্ ততক্ষণ আশ। আমাদের চেষ্টা করতে আমরা কসুর করব কেন? ডাক্তার সারা রাত্রের জন্য ৪ দাগ ওষুধ দিয়ে ক্রমাগত মাথায় বরফ দেবার উপদেশ দিয়ে গেলেন। ফিয়ের টাকাটা আমি দিতে যেতেই কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মা-বাপ দু'জন উপর দিকে হাত তুলে আমাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ কর্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু সে আশীর্ব্বাদ যেন আমার বুকের মাঝখানটায় কেবলি থেকে থেকে সূচ ফুটিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

বাপ বেচারাকে কিছুই কর্ত্তে হল না। সে এক পাশে আপন মনে চুরুট টান্‌তে লাগল, ভাইটেও সারাদিন খেটে-খুটে হয়রাণ হয়ে পড়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল। কেবল মা বেটী ও আমি, দু'জনে পাশে ও শিয়রে বসে মেয়েটার শুশ্রূষা করতে লাগ্‌লাম। মা আমার বরফ দেওয়া দেখে ২।১ বার জিজ্ঞাসা করলে বাবু! 'এই ঠাণ্ডার রাত্রে বরফ দিচ্ছ! ভাল হবে ত?'

'নিশ্চয়! বরফেইত জ্বর কম্‌বার কথা।' মা অমনি মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে দেখে বল্‌লে, 'তাইত বাবু! এখনও ত মাথা খুব গরম; তবে কি ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে আরও আনাবো?'

উত্তরে বল্‌লাম—'থাক্ এখন। যা হয় পরে দেখা যাবে।'

* * * * *

মাথায় বরফ দিচ্ছি, আর মনে মনে ভগবানকে ডেকে বল্‌ছি, দয়াময়! ওর সকল ব্যাধি যন্ত্রণা আমাকে দিয়ে ওকে নিরাময় করে দাও। আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাসিমুখে তোমার পায়ের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিই। নইলে কোন প্রাণে ওর মাকে মুখ দেখাবো! সংসারে আমার বেঁচে থাকা যে একান্তই দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌বে।

সারা রাত ধরে অলক্ষ্যে কে যেন অনবরত গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে লাগ্‌ল। তার সেই করুণ কান্নার ছবি বৃষ্টি ধারার মধ্য দিয়ে এসে থেকে থেকে কেবলি আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মুখ তুলেই দেখি মা-বেচারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবলি কাঁদ্‌ছে। বাইরেও অজস্র বাদল-ধারা ও বাতাসের শব্দের মধ্যে কান্নার বিরাম নাই। বুকটায় মধ্যে কেমন একটাবার দুর্ দুর্ করে উঠ্‌ল। থার্ম্মোমিটারটা দিয়ে পরখ করতেই দেখি জ্বরের উত্তাপ ঢের কম। আইস্-ব্যাগ্‌টি মাথা থেকে নামিয়ে রেখে ব্র্যাণ্ডি আরেক্ ডোজ্ দিলাম। মা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, 'বাবু! বরফ দিচ্ছ না যে! বরফ দিলে যে জ্বর ছাড়বে ব'লেছিলে?' ছোট্ট করে উত্তর দিলাম—জ্বর নাই।

'জ্বর নাই?' মা আহ্লাদের ভরে আবার উপর দিকে দু'হাত যোড় করে তাকালে।

হায় ভগবান্! এত অভিনয়ও মানুষকে কর্‌তে হয়! সত্যিকথা বল্‌বার আর সাহস হ'ল না। মেয়েটা একটা বার মাত্র গা ঝাঁকানি দিলে, তার পর···সব নীরব।

মা অসীম পুলক ভরে মেয়ের কপালের উপর হাত রেখে মুখের উপর ঝুঁকে পড়তেই আমি মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে চোখ দু'টি ঢেকে বসে রইলাম

তারপর বিকট চীৎকারে ঘরখানি কাঁপিয়ে তুলে মা-বেচারী মেয়ের বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে মূর্চ্ছা গেল। তার মরদ ছুটে এল, বেটা ছুটে এল।

আমি আর এ দৃশ্য দেখ্‌তে পারলাম না, সেই মুহূর্ত্তেই পাগলের মতন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম।

* * * * *

পরদিন বেলা নয়টা। মেয়েটাকে কখন নিয়ে গেছে জানিনে। বাড়ীখানার দিকে আর তাকানো যায় না। সেই দিনই অনেক চেষ্টা করে আরেকখানা বাড়ী খুঁজে নিয়ে বহুকালের এই পুরাণো বাড়ীখানা ছেড়ে চলে গেলাম !!!

খোঁপার ফুল

১

আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখনই আমি রামায়ণ পড়তে শিখি। শুধু শিখি বল্লে ঠিক বলা হ'ল না। আমার মতন অমন সুর করে' রামায়ণ পড়তে ঠিক আমার ঐ বয়সে আর নাকি কেউ পারত না। যদিও আমার কর্কশ স্বরটী আমার নিজের কাণেই কেমন বিশ্রী শোনাত, তবু এরই প্রশংসা আর কারো মুখে ধরত না। সবারই মুখে কেবল এই এক কথা, আহা! পুঁথি যদি কেউ পড়ে ত ঘনশ্যাম। কি চমৎকার গলা! শুনে শুনে আমারও একটু খানি অহঙ্কার বেড়ে গেল। প্রায়ই দেখা যেত কোন বাড়ীতে রামায়ণ কি মহাভারত পড়বার আবশ্যক হ'লে অমনি টুক্ করে পিসীমা গিয়ে সেধে আমার জন্যে পুঁথি পড়ার বায়না নিয়ে এসেছেন। ফলে পুরাণ-পুঁথি পাঠের উপরই আমার যত রাজ্যের ঝোঁক চেপে পড়ল। ইস্কুলের পুঁথি-পত্রের সঙ্গে আর তেমন সম্পর্কই রইল না।

বাবা থাক্‌তেন বারোমাস বিদেশে। মা কড়া অভিভাবক হলেও তাঁর সাধ্য কি, যে পিসীমার সাম্‌নে আমাকে শাসন করেন। বছরের প্রায় ৮।৯ মাস তিনি আমাদের সংসারে থাক্‌তেন। এই সময়টায় তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে যে শাসন দণ্ড পরিচালনা করতেন, তার ভয়ে অনেককেই সশঙ্ক হয়ে থাক্‌তে হত। মা আমার সম্বন্ধে কোনো কথা বল্‌লেই অমনি পিসীমা তাঁকে টাট্‌কা শুনিয়ে দিতেন, 'তিন তিনটাকে

যমের মুখে দিয়ে ত এই ছেলে পেয়েছ বউ! ত্থাখ তোমার কপালে ওর পনরটা বছর কাটুকই আগে! তার পরে নয় শাসন কোরো।'

পিসীমার এই সস্নেহ তিরস্কারে মা যেন একেবারে গলে জল হয়ে যেতেন। উভয়েরই চোখের কোণে কোণে তখন অশ্রুরাশি এসে জমা হ'ত।

এমনি করে পিসীমার আদরে আবদারে রামায়ণ মহাভারত পড়ে পড়েই আমার শৈশবটা একরূপ কেটে গেল।

আমার লেখা-পড়া শেখার জন্যে যাঁর এতটুকু মাত্র মাথা-ব্যথা ছিল, সেই মা আমার পনর বছর বয়স হবার আগেই আমাকে পিসীমার হাতে স'পে দিয়ে, তাঁর আর তিনটি ছেলেকে যেখানে পূর্ব্বেই পাঠিয়েছিলেন, সেখানে চলে গেলেন। বাবা সংসারের এই দুর্ঘটনায় এমনি ভেঙ্গে পড়লেন, যে চাক্‌রীতে আর মন টেঁকাতে পারলেন না। অগত্যা চাকরী ইস্তফা দিয়ে বাড়ী এসে একেবারে ঘর ধরা হয়ে পড়লেন।

পিসীমা এইবারে বাবাকে নানা রকম সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে রেখে আমাকে নিয়ে তাঁর বাড়ী ফিরে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, যদি তাঁর এই মাতৃহীন অন্তরঙ্গটীকে কোন উপায়ে যমের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন ত, রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ না করে আর ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দেবেন না। বিশেষতঃ এখানে থাক্‌লে মায়ের অভাবটা বড় তীব্র হয়ে উঠ্‌বে। তাতে অসুখ বিসুখ কত কি হতে পারে, কে জানে।

পিসীমার এই সাধু-সংকল্প যে কতদূর গিয়ে কাজে দাঁড়াল, সেই কথাটাই বল্‌ছি।

২

পিসীমাদের গ্রামে একটা এণ্ট্রান্স স্কুল ছিল। সেখানে নামে মাত্র ভর্ত্তি হলাম। কাজে বেড়াতে লাগলাম, পিসীমার পেয়াদাদের সঙ্গে এগ্রামে ওগ্রামে ঘুরে ফিরে, আর বাড়ী বাড়ী রামায়ণ মহাভারত পড়ে। ইস্কুলে কখন কখন লোক দেখানো পড়া পড়তে যাই, আর পড়া বল্‌তে না পেরে বেত খাই। এদিকে পাড়ার ছেলেদের কাছেও লজ্জায় মুখ দেখাতে পারিনে। তারা যখন তখনই আমাকে দেখলে টিটকারি দেয়। এইত আমার অবস্থা। কিন্তু পিসীমার ভয়ে তারা সব সময়ে বড় সাহস পেত না। এমন কি পাড়ার কোন মাষ্টার ইস্কুলে আমাকে মেরেছে শুন্‌লে পিসীমা অমনি তদ্দণ্ডেই হাঁ হাঁ করে তার বাড়ীর উপর গিয়ে পড়তেন, এবং যত দূর যা মুখে আসত বলে ফেলতেন।

মাষ্টারদেরও তাই আমাকে শাসন করবার কোনো বালাই ছিল না। এইরূপেই দিনের পর দিন অনায়াসে কাটতে লাগল। আমারও পনর বছর বয়স নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে গেল দেখে পিসীমার ও আমার মন থেকে যে একটা মস্ত আতঙ্ক কেটে গেল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই বারে পিসীমার বাড়ীতে তাঁরই ব্যয়ে খুব ঘটা করে আমার উপনয়ন হল। নতুন বামুনের মুখে বৈশাখ মাসের দিনে পুঁথি শোনায় না কি মহাপুণ্য, সুতরাং আমার আদর যে কতখানি বেড়ে গেল, সে কথাটা না বললেও চলে। এই সূত্রে বনমালী ভট্টাচার্য্যের মেয়ে ষোড়শীর সঙ্গে আমার আলাপটা খুব ভাল মতেই জমে গেল। আমি রামায়ণ পড়তাম, সে চুপ করে এক দৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে থাকৃত। কি দেখত সেই জানে।

কিছু দিনেই বুঝতে পারলাম, আমার তরুণ মনের উপর সে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। এক মুহূর্ত্তও যেন ষোড়শীকে নইলে আমার চলবার উপায় নাই। সকালবেলা পিসীমার পূজার ফুল তুলতে যাব তাও তাকে সঙ্গে চাই। সে ফুল তোলে, আমি একটি কোণে চুপ করে বসে তার অলক্ষিতে ঝরা-ফুল কুড়িয়ে এক গাছি মালা গাঁথি। সে মালা হয়ত যার জন্যে গাঁথা হয়, তাকে আর দেওয়া হয় না। বাড়ীতে দেয়ালে টাঙ্গানো রাধা-কৃষ্ণের ছবির ফ্রেমে তার স্থান নির্দ্ধারিত হয়ে যায় এবং সেই খান থেকেই শুকিয়ে শুকিয়ে তার দলগুলি ঝরে পড়ে গিয়ে আবর্জ্জনার সামিল হয়। কখন বা সে হয়ত নিবিষ্ট চিত্তে একটি গাছের ডাল টেনে নুইয়ে ধরে ফুল তুলছে, আমি অমনি সেই সময় চুপি চুপি এমনি ভাবে গিয়ে তার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিয়েছি যে সে টেরও পায়নি। কিন্তু যেমনি হয়ত বলেছি 'বল্‌তো ষোড়শি, তোকে কে ফুল পরিয়ে দিলে ?' অমনি সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে হয় ফিক্ করে হে'সে ফেলেছে, নয় অনুযোগের স্বরে বলেছে 'ছিঃ !'···আহা সে অনুযোগ না জানি কত মধুর !

এমনি করেই দু'জনের কৈশোর জীবন বেশ স্বচ্ছন্দে কাটতে লাগ্‌ল। কোন আবিলতা নাই, পঙ্কিলতা নাই, উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ নাই, এমন সুন্দর স্বচ্ছ দু'টি জীবনের ধারা।

কত রকম কল্পনার বিচিত্র বর্ণে-ই যে ভবিষ্যতের ছবিখানি আঁকতে থাকি, তা আর বলা যায় না। রংটা কখনো গাঢ় হয়ে ছবিখানি আমার চোখের সাম্‌নে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আবার কখনো এমনি ফিকে হয়ে পড়ে যে কিছুই চোখে দেখা যায় না। এমন করে শুদ্ধো মনের খোরাক জোগাতে পারলেই যদি জীবন ধারণটা সুগম হত, ত কথা ছিল না। কিন্তু দেহের খোরাক যে একান্ত আবশ্যক। তার জন্যে বাইরে থেকে সময় সময় এমন এক একটা কাজের তাগিদ এসে হাজির হতে থাকে, যাকে

আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না ; তাই আবার নিজকে এনে সংসারের দশ জনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হয়।

এই দশজনকে না হলেও উপায় নাই। অথচ এরাই যত সুখের পথে অন্তরায়।

তবুও সমস্ত কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে যে অবসরটুকু করে নিতাম, সেটুকু কত মধুর, কত বৈচিত্র্যময়। এই মধুর বৈচিত্র্যময় অবসরের মধ্য দিয়েই কতক মিথ্যার কুহকে, কতক সত্যের কঠোরানুভূতিতেই জীবনের অনেকটা দিন কেটে গেল।

সেবার ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি। সেদিন রবিবার, আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন দুপুর। খোলা জানালার ধারে বসে পড়ছি রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।' সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গ রাণীর বর্ষা চিত্রখানি যেন অক্ষরে অক্ষরে কবির কবিতায় চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল।—কি সুন্দর! পড়তে পড়তে কবিতার সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেলাম। থেকে থেকে ঝম ঝম করে কেবল বৃষ্টি ঝরতে লাগল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কাণের ভিতর এসে বাজতে লাগল 'ভবন শিখীর নৃত্য, এখনো হরিছে চিত্ত, এখনো জাগিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।' এমন সময় দরজার কড়াটা একবার ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। মনে করলাম বাতাসের শব্দ। কিন্তু অচিরেই সে ভ্রম দূর হয়ে গেল। ঘরে ঢুক্‌ল ষোড়শী।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। 'হঠাৎ জলে ভিজতে ভিজতে যে এমন অসময়ে ?'

ষোড়শী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে 'বলত কি জন্যে এসেছি ?"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলাম 'তা কি করে বলব বল্‌ত ?—আমি ত আর অন্তর্যামী নই যে মানুষের মনের কথা টেনে এনে বল্‌ব !'

ষোড়শী অভিমানের সুরে বল্‌লে ‘হুঁ আচ্ছা যাও তুমি।’

‘যাব কিরে—‘বল্ না ?’ বলেই তার ডানহাত খানা চেপে ধরলাম। অমনি ঝপাং করে একখানা খাতা তার হাত থেকে মেঝের উপর পড়ে গেল।

যেতেই দেখি কি সে খানা আমারি কবিতার খাতা। ষোড়শী ত লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে বোধ হয় মনে করেছিল, চুরিটা ধরা পড়বার আগেই এমনি ভাবে সেটাকে সামলে যাবে, যে আমার এতটুকুও জানবার জো থাক্‌বে না, প্রকৃত ব্যাপারটা কি। কিন্তু যখন একান্তই ধরা পড়ে গেল, তখন যা তা একটা কৈফিয়ৎ দেবারও নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অমনি বলে ফেল্‌ল, ‘চাইলে হয় ত দিতে না তাই না চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এজন্যে আমাকে মাফ কোরো।’

হাত দু’ খানি ধরে রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম ‘কেন নিয়েছিলে ?’

মুখ খানি হেঁট করে থেকেই সেও জবাব করলে ‘লেখা নিয়ে আর কি করে লোকে পড়ে।’

জিজ্ঞাসা করলাম ‘তুমি কবিতা বোঝ ষোড়শি !’

‘কই আর তেমন বুঝি ? রামায়ণ মহাভারতের লেখা গুলি বেশ শুদ্ধ। পড়লেই বুঝতে কষ্ট হয় না।’

‘আরও সহজ ও সুন্দর লেখা পড়ব শুন্‌বে ?’···বলেই তার উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করে পড়ে যেতে লাগ্‌লাম। ‘বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী’।—সে একদৃষ্টে আমার মুখের পানে—তাকিয়ে থেকে আগা গোড়া কবিতাটীকে শুনে গেল, তারপর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠ্‌ল ‘ভারী ত চমৎকার !’ বল্‌তেই লজ্জায় তার মুখ খানি গোধূলির রশ্মির ন্যায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি তেমন পরিপক্কতা লাভ করে না, অথচ

কল্পনা থাকে খুব উদ্দামে,—ঠিক সেই বয়সই তখন আমার। কল্পনার খেয়ালে যা মনে আসে, কলমের মুখেও হুবহু তাই এসে যায়। এমনি করে অনেকগুলি ছড়া ও পদ্য দিন কয়েকে লেখা সারা ক'রে তার নাম দিলাম "যৌবন স্বপ্ন"। এই খাতা খানি কোনো দিন ষোড়শীর হাতে পড়ে ত বিপদ যে আরও সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌বে। যাক্ আপাততঃ আর সে আশঙ্কা রইল না। কেন না ষোড়শীর দর্শন লাভ একরূপ দুর্ঘট হয়ে উঠ্‌ল।

এইরূপে কিছুদিন কেটে যেতেই, হঠাৎ একদিন পিসীমার মুখে যে সংবাদটা পেলাম, তাতে বুকটার মধ্যে যে কেমন করে উঠল, সে কথাটা বোধ হয় না বল্‌লেও চলে। মনে হতে লাগ্‌ল, এক সঙ্গে যেন বসন্তের সমস্ত তান কোকিল প্রকৃতির কুঞ্জবনে ঝঙ্কার দিয়ে দিয়ে এই আনন্দ বার্ত্তাটার ঢেউ জগৎময় ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সে নব কুসুমে মৃদু স্পন্দন জাগিয়ে তুলে বসন্তের মন্দানিল সে দিন আমার ললাটে যে স্পর্শটুকু বুলিয়ে গিয়েছিল,—জানি না সেটা আমারি ভাবী বধুর স্নেহ-শীতল করের স্নিগ্ধ স্পর্শ কি না।



সপ্তাহ খানেক পরে একদিন অপরাহ্নে পিসীমা গম্ভীর মুখে পাড়া থেকে বাড়ী ফির্‌লেন। ভাবলাম নিশ্চয়ই বাড়ী থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে। হঠাৎ কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ত সাহস হল না। শেষে যখন তাঁর নিজের মুখেই ব'লে যেতে শুন্‌লাম 'ছোট বামুন কিনা তাই ওর কথার ঠিক নেই। ওর আবার কোন্ জন্মে কে ছিল ভট্‌চাজ! চিরকেলে খোলা কাটা চক্কবর্ত্তী বামুন! দু'টো পয়সার মুখ দেখেছে কিনা, তাই হ্যান্ করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে। আদতে খাবে গোপনে মেয়ে বেচে টাকা

অথচ মুখে বিট্‌লে বামুনের লম্ফ-ঝম্পের অন্ত নেই!’—বল্‌তে বল্‌তে তিনি ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বাল্‌বার উদ্যোগ করতে গেলেন।

আসল কথাটা জান্‌তে পারা গেল, আমি ভালমত যদি এণ্ট্রান্স পাশ করতে পারি ত আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির কি রকম আশা আছে না আছে, মোটামুটী তার একটা ধারণা করে তবে ষোড়শীকে আমার হাতে সমর্পণ করা হবে।—কথাটা খুবই সঙ্গত। কিন্তু এর মধ্যে যে কত বড় একটা ফাঁকি লুকিয়ে ছিল, সেই কথাটাই বল্‌ছি।

ছয় মাস পরে আমার পরীক্ষার ফল বের হ’ল। দেখি কি ফার্ষ্ট-ডিভিশনে পাশ হয়েছি।—এরূপ অভাবনীয় সফলতার গর্ব্বে বুকটার মধ্যে যে কেমন করতে লাগল, তা অন্তরে থেকে টের পেলেন অন্তর্যামী। আর বাইরে থেকে যদি কেউ পেয়ে থাকেন ত, সে পিসীমা। তিনিই আমাকে একদিন এই আনন্দের সংবাদটা বাবার কাছে বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে বল্‌লেন। তবে এ কথাও বলে দিলেন ফিরতে যেন বিলম্ব না হয়।

পিসীমার নির্দ্দেশ মত কাজ করা ঘটে উঠ্‌ল না। বাড়ী গিয়েই দেখি বাবার অসুখ। সেই অসুখ আরাম করে তুল্‌তে প্রায় মাসাবধি কাল কেটে গেল।

বাবাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলে আবার হাল্‌কা প্রাণে পিসীমার বাড়ী মুখো রওনা দিলাম। অজস্র উল্লাস যেন সেদিন আমার চারদিকে প্রকৃতির মুক্ত বক্ষে ছড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ মধুমতী পার হতেই দেখি কি বেলা অবসান হয়েছে। কোথা থেকে শানাইয়ের করুণ-রাগিণী বাতাসে ভেসে ভেসে আস্‌ছে। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে সে দিক্ পানে কাণ পেতে রইলাম। ওই যে বনমালী ভট্‌চাজের বাড়ীর দিক থেকেই বাজনাটা শোনা যাচ্ছে ম্লায়মান সূর্য্যের যে রশ্মিটুকু তখনো গগন-প্রান্তে ঝিক্-মিক্ করছিল,

আমার চক্ষে সেটুকু যেন সেই মুহূর্ত্তে নিবে গেল। আমার চারদিকে এক দুর্ভেদ্য অন্ধকারের প্রাচীর তুলে দিয়ে বিশ্বজগৎ কেবলি যেন আমাকে উপহাস করতে লাগ্‌ল।

আকাশে প্রতি রাত্রেই ত তারারা দল বেঁধে এসে ভিড় করে। কিন্তু সেদিনকার মতন অমন তারার ভিড় আর কখনো যেন দেখি নাই। অমন অন্ধকারও আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছিল, আলো ও আঁধারে যেন একটা আড়াআড়ি চল্‌ছে।

সময় সময় সংসারে এমন সব অসম্ভব ঘটনা ঘটে থাকে, যার জন্যে নিজের দু'টি চোখ ও কাণ দু'টাকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু সেদিন নিষ্ঠুর নিয়তির বিদ্রূপের চেয়েও কঠোর যে কথা কয়টী পিসীমার নিজের মুখ থেকেই শুন্‌তে পেলাম, তাতে ত অসম্ভব বলে কিছুই মনে হল না। তিনি আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন "আজ হল বনমালীর মেয়ে ষোড়শীর গায়ে হলুদ—কাল বিয়ে।"—মনে হল আরেকটুখানি চাপা গলায় যেন বল্লেন "নেহাৎ মন্দ হয় নি। ছোট কুলীন হলেও ছেলেটী বি-এ পাশ।"

৪

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনে। চোখ চাইতেই দেখি কি, উষালক্ষ্মীর রক্ত গণ্ডের আভায় পূর্ব্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে। হাসি যেন তার দুই চাপা ঠোঁটের পাশ দিয়ে কেবলি উপ্‌চে উপ্‌চে পড়ছে।

আজ ষোড়শীর বিবাহ। তারও মুখখানি হয় ত আজ এমনি রাঙা হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের দুই পাশ গড়িয়ে উষালক্ষ্মীর মতনই হাসির লহর বয়ে

চলেছে। তা চলুক। তার সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ? আমি এসেছিলাম একটা ধূমকেতুর মতন। তা—আজই এই মুহূর্তেই চলে যাচ্ছি।

সেই দণ্ডেই 'যৌবন-স্বপ্নের' পাতাগুলি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মধুমতীর জলে ভাসিয়ে দিলাম। হায়! হায়! করলাম কি! যদিই ষোড়শীকে ভুল বুঝে থাকি ত, এ গুলি যে তারই স্মৃতি চিহ্ন।—জীবনের পথে চল্‌বার যে কোনোই সম্বল রাখলাম না।

* * * *

হঠাৎ আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল পিসীমার কথায়। তিনি বলতে বলতে আসচেন, 'তাইত মেয়েটার যে রকম জ্বর হয়েছে, এতে বিয়েটা এখন ভালয় ভালয় সমাধা হলে হয়। দেখ ত কপালের লেখা।'

পিসীমার কথাটা প্রথমটায় ভাল রকম বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু যখন বিছানা থেকে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার জ্বর হয়েছে বলচ পিসীমা?' তখন তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে ফেললেন, 'আর কার হবে বাছা, ষোড়শীর। ক'দিন ধরে কেবল অবেলায় চান করে গা ধুয়ে এই কাণ্ড করে বসেছে। যেমন জ্বর তেমনি কাসি।'

পিসীমাকে সুমুখ থেকে একরূপ ঠেলে দিয়ে ছুটে গেলাম ষোড়শীদের বাড়ী। ষোড়শীর মা আমাকে দেখে হাউ মাউ করে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন 'একবার ষোড়শীকে দেখবে এসো বাবা!'

'দেখতেই ত এসেছি, ভিতরে চলুন'—বলেই ভিতরে ঢুকে পড়লাম। গিয়ে দেখি, খাটের উপর ষোড়শী শোওয়া। তার ছোট বোন মানসী—তার মাথায় জল-পটীতে আস্তে আস্তে জল দিচ্ছে। ডাকলাম 'ষোড়শি!' —আচমকার মতন একবার আমার দিকে তাকিয়েই সে মুখখানা সরিয়ে নিলে। মানসী আমাকে বস্‌তে বলে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। যেতেই

আমি গিয়ে ষোড়শীর শিয়রে বসে জল-পটীতে জল দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন এমন করে অসুখটা করে বস্‌লে ষোড়শি!—' ষোড়শী আমার ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুপি চুপি বল্লে 'আমার অসুখে তোমার কি বড্ড ভয় হয়েছে?——ভয় নেই, আমি সেরে উঠ্‌বো।'

"তুমি ভাল হয়ে ওঠো ষোড়শী, তা হলেই হল।" কথাটা বল্‌তে আমার গলার স্বরটা একটুখানি কেঁপে গেল।

ষোড়শী এটা লক্ষ্য করে আমার হাতের আঙ্গুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, আর ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগল 'সেরে ত উঠিইছি, সেজন্যে অত ভাবনা কেন?—বেঁচে থেকেই অনেকের মনে হয়ত দাগা দিয়ে গেলাম, মরে গিয়ে সেটাকে আরও শেষ করে দিয়ে লাভ কি?'

ইতি মধ্যে ঘরে ঢুকলেন ষোড়শীর মাতা। নিতান্ত অপরাধীর মতন আমার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বাবা! আমার পর্ব্বতের মতন আশা ছিল। সবই চুরমার হয়ে গেল। কি করবো অদৃষ্ট!"

কথাগুলি যেন নেহাৎ বিদ্রূপের মতন মনে হতে লাগল। আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও টিকতে পারলাম না। নীরবে ষোড়শীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।



পরদিন বর-ভোজনের পর কুলীন বিদায়ের মোহর-থান হাতে করে যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন সকলের চেয়ে মর্য্যাদায় আমিই শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব্বে আমার বুকটা যে ভরে না উঠে ছিল এমন নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভারটাও যেন কেমন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিল।

বহুক্ষণ মোহর-থান হাতের মধ্যে চেপে ধরে রাখলাম। পরে সন্ধ্যার

অন্ধকার যখন বিবাহ বাড়ীর উপর উৎসব-নাট্যের কৃষ্ণ-যবনিকা খানি ঝুপ করে ফেলে দিয়ে গেল, তখন সত্য সত্যই মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। একবার ষোড়শীদের বাড়ীর দিকে আঁধারে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি গেলাম। বাড়ীর সুমুখে গর্ত্তের মধ্যে স্তূপীকৃত এঁটো পাতার স্বত্ব নিয়ে শিবা ও সরমা নন্দনদের বিবাদ তখনো থামে নাই।

বাহির বাটীর আটচালায় দুই চার জন প্রতিবেশী তামাক টান্‌ছেন, আর বিয়েতে বনমালীর কি পরিমাণ ঋণ হয়েছে, তার একটা মোটামুটী আন্দাজ করছেন। কেউ বা বল্‌ছেন, না হে বনমালীর সিকি পয়সাও ঋণ হয় নি। আবার কেউ বা হয়ত বনমালীর একান্ত অন্তরঙ্গ অমনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠ্‌ছেন, কি বল হে! কম পক্ষে এই ক'টি শো টাকা ধার হয়েছে, বলে হাতের ক'টা আঙ্গুল দেখাচ্ছেন সেটা আর দেখা গেল না। মোটের উপব বুঝ্‌তে পারা গেল যে, বনমালী নীচ-কুলীনে কন্যাদান করেও ঋণ দায় থেকে মুক্তি পান নি। তখনি আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব না করে সোজা বনমালীর বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লাম। বনমালী তখন বিষণ্ণ মুখে বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখেই উঠে এসে তটস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি 'বাবা? কি মনে করে?'

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে তাঁর ডান হাতখানা টেনে এনে মোহর থান তাঁর হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লাম, 'কিছু মনে করবেন না।'

বনমালী ক্ষণকাল আমার মুখের পানে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে ঈষৎ কর্কশ স্বরে বলে উঠ্‌লেন 'কি বাড়ীর ওপর এসে আমাকে অপমান!'

আমি মিনতির স্বরে হাতজোড় করে বললাম, 'ছিঃ অমন কথা মনের কোণেও ঠাঁই দেবেন না। আপনি যে দশজনের সাম্‌নে আমাকে হাতে

করে দিয়েছিলেন, ওইতেই আমার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা হয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন ত বলি, যোড়শীর বিয়েতে আমারও ত কিছু দেওয়া উচিত।' বল্‌তেই দেখি কি বনমালীর মুখখানা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

ব্রাহ্মণ তখন মোহর থানটিকে কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে চাপা গলায় বলতে লাগলেন, 'বলব কি বাবা! তোমার মতন যদি দেশের আর সব কুলীনরা হ'ত ত কথাই ছিল না। আমার দেহে যে রক্তটুকুন ছিল, তা এই বারের বিয়েতে শুষে নিয়েছে।' বল্‌তে বল্‌তে একবার যোড়হাতে উর্দ্ধমুখ হয়ে বোধ হয় দেবতাদের কাছে আমার জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করলেন, এবং অচিরেই অন্যান্য কুলীনদেরও আমার মতন সুমতি হোক, এই বলে প্রার্থনাও জানিয়ে রাখলেন।

* * * *

আর এখন যোড়শী এ গ্রামের কেউ নয়। তার কল্পিত ছবিখানি অহোরাত্র এই হৃদয়ের পটে অঙ্কিত থাক্‌লেও, তার বাস্তব চিত্রখানি ত যখন তখনই ইচ্ছা করলে চোখের সামনে দেখতে পেতাম। কিন্তু কই? সে উপায় ত রইল না।—প্রতিমা শূন্য মণ্ডপে শুধু যে নির্ব্বাক হাহাকার বই কিছুই নাই।

আবার তেমনি করে জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তিময়ী উষারাণী পরদিন প্রভাতে ললাটে সিঁদূরের টিপ পরে ফুলের ডালি হাতে করে হাসতে হাসতে প্রাচীদ্বার খুলে এসে দেখা দিলেন। আবার তেমনি করে মধুমতীর জলে সোণা গলিয়ে ঢেলে দিয়ে গেলেন। তেমনি করে গাছে গাছে ফিস্ ফিস্ শব্দে কি কথা বলে বৈতালিক গানের জন্য পাখীদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলেন। আঃ কি সুন্দর!—সেই উষা। সেই চির পুরাতন, সেই চির নূতন পৃথিবী।—কোনোই ত পরিবর্ত্তন হয়নি তার।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যে ভাঙ্ ধরেছে, তা ত কেউ দেখচে না। একমাত্র অন্তর্য্যামী বল্‌তে পারেন কি ছিলাম, আর কি হয়েছি। না—না—আর এক মুহূর্ত্তও ত এখানে থাক্‌তে পারব না। যাব যেখানে ষোড়শীর সঙ্গে আর কস্মিন্ কালেও সাক্ষাৎ হবে না, এমন জায়গায়। যেখানে গেলে আমার চির-সুখের, চির-দুঃখের বাংলাকে ভুলতে পারবো।—ওঃ।—

৬

তিন তিনটি বছর বাংলার বাইরে থেকে না পেরেছি এল-এ পাশ কর্‌তে, না পেরেছি টেক্‌নিক্যাল একটা কিছু শিখ্‌তে। মিছে মিছি বাবার কষ্টলব্ধ অর্থই ধ্বংস করেছি। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে কাণপুরে এসে চাক্‌রী নিয়েছি। খাই দাই মনের আহ্লাদে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে যাই, কিন্তু ভিতর থেকে একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি। সকলেরই মুখে দিনরাত কেবল ওই টাকা পয়সা, ওই থিয়েটার, ওই বায়োস্কোপ, ওই তাস, পাশা, দাবা। কেউই কারো মর্ম্মের খবরটী জানবার জন্যে এতটুকু আগ্রহও দেখায় না। আমার অপর্য্যাপ্ত দুঃখের ভাণ্ডার নিয়ে যে বাংলা দেশ আমার চোখের আড়াল হয়েছিল, কই সেত আমার মনের আড়াল হয়ে থাক্‌তে পারলে না।—কেবলি যে চোখে পড়তে থাকে পিসীমাদের সেই ছোট গ্রামখানি, যার কোল ঘিরে খর-স্রোতা মধুমতী কল কল নাদে বয়ে চলেছে, সেই বনমালী ভট্টাচার্য্যের বাড়ী—সেই সব!…এত করে বাংলাদেশের বাইরে থেকেও বাংলাকে ছাড়তে পারলাম না। যাকে দিয়ে মন ভোলাতে পারব, সেই নিঃসঙ্গ

জীবনের একমাত্র সহায় কবিতা আমাকে ছেড়ে গেছে। কতবার লিখ্‌তে গেছি, মনে করেছি, এই লেখাটা ষোড়শীকে উপহার দেব, কিন্তু কলমের মুখে এসে পড়েছে এক ঘেয়ে কান্না। কথায়, কথায় কেবলি ভাবের অমিল, ছন্দ পতন, ভাষার ভুল।

বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই বছর খানেকের মধ্যে পরিবার এনে যখন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলেন, তখন আমাকেও তাঁদের দলভুক্ত করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে কসুর করলেন না। আমি যে তাঁদের মতন নই, সে কথা বহুবার বলেও তাঁদের বোঝানো যায় না। ষোড়শীকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখ্‌তাম, জবাব পেতাম, হঠাৎ সেই সব চিঠি-পত্রের একখানা খামের উপরে মেয়েলী ছাঁচের লেখা নাম ধাম দেখে অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে আমাকে অনেক আশ্চর্য্য রকমের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করলেন। মানুষের কৌতূহল যে কতদূর উদ্দীপনাপূর্ণ, তা পূর্ব্বে কখনো টের পাইনি। যাক্, তাঁরা আমার জবাবে নিরাশ হয়ে আমার নামের সঙ্গে অসামাজিক এবং আরও অতিরিক্ত কিছু বিশেষণ যোগ করে দিয়ে আমাকে তাঁদের দল থেকে খারিজ করে দিলেন।—বাঁচলাম!

এইরূপে কতদিন যায়। ষোড়শীরও বহুদিন যাবৎ কোন চিঠি-পত্র নাই। মনটা যেন কেমন কেমন ঠেকতে লাগল। এ পর্য্যন্ত তাকে ত হাতে করে কিছুই দেওয়া হয় নি! মোহর খানা যে দিয়েছিলাম, তার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সে কথা যাক্। করলাম কি। সেই দিনই অফিস থেকে ফিরবার পথে একটা নামজাদা জুয়েলারি ফারমে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। গহনা-পত্র অনেক রকমই ঘাঁটাঘাঁটি করা গেল। কিন্তু কিছুই পছন্দ হ'ল না। হঠাৎ ফিরবার মুখে চোখে পড়ল দরজার পাশে একটি গ্লাস-কেশের মধ্যে মাঝখানে রুবি বসানো একটী সোণার ফুল। পছন্দ হতেই যে দাম চাইলে দিয়ে নিয়ে এলাম। ষোড়শীর খোঁপায়

ফুলটা বেশ মানাবে। আঃ!—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুকটা অনেকখানি হাল্‌কা করে নিলাম।

পরদিনকার ডাকেই পার্শেল করে ফুলটি ষোড়শীর নামে পাঠিয়ে দিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে তার চিঠির আশায় দিন গুণ্‌তে লাগলাম।

সাত দিনের দিন পার্শেলটি ফিরে এল। মনের যে তখন কি অবস্থা হয়েছিল, সে কথা স্মরণ নাই। হায়, হায়! তবে কি আমার সকল যত্ন চেষ্টাই ব্যর্থ হল।—একখানা চিঠি ওই ডাকেই পেলাম, ষোড়শীর হাতের আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা। এত বিশ্রী লেখা ষোড়শীর। মিথ্যা কথা। কিন্তু মিথ্যা ত নয়। শিরোনামার প্রতিটি অক্ষরই যে আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে দিচ্ছিল 'এ ষোড়শীরই হস্তাক্ষর।'

চিঠি খুলতেই হাতখানা বারবার কেঁপে উঠতে লাগল! ষোড়শী লিখেছে—

শ্রীচরণেষু—

অনেকদিন পরে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি। বোধ হয়, এই আমার শেষ চিঠি। হয় ত যখন গিয়ে এই চিঠিখানা পৌছবে, তার আগেই আমি এ সংসার থেকে বিদায় হব।

ফুলটি পাঠিয়েছিলে, খোঁপায় পরে ছিলাম। আবার যেমনি এসেছিল, তেমনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। সেই তিন বৎসর পূর্ব্বেকার জ্বরের কথা জান ত? জ্বর ও বুকের বেদনা তখনকার মতন ভাল হয়ে যায়। কিন্তু শরীরের উপর একটুখানি অত্যাচার হ'লেই আবার দু'টো এসে দেখা দেয়। আজ ছ'মাস যাবৎ আমি অসুখে ভুগছি। অসুখ এখন ক্ষয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দুঃখ করবার কিছুই নাই।—জানই ত, সংসারের রীতিই এই। তোমার হাতের দেওয়া জিনিস এ বাড়ীতে আর কে

পরবে? আমার তাই এই অন্তিম অনুরোধ—খোঁপার ফুল খোঁপায়ই যেন ওঠে। আর না। বড়ই হাঁপিয়ে পড়ছি। আমার প্রণামটি গ্রহণ করতে আর অনুরোধটি রক্ষা করতে ভুলোনা। আর সবই ভুলে যেয়ো।

ইতি সেবিকা—
তোমারই ষোড়শী।

৭

আরও তিন-বৎসর কেটে গেছে। সংসারের কোথায় যে কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, সে খোঁজ কিছুই রাখবার আর অবসর নাই। বাবা এতদিনও জীবিত ছিলেন। গত বৎসর তাঁর দেহান্তর হয়েছে। এই সব কারণেই আর ও দেশে যেতে ইচ্ছে হয় না। যা হোক্ সংসারের মায়া একরূপ করে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। মায়ার এতটুকু সূত্র আছেন এক পিসীমা। এ বুড়ীর মরণ হলে কোনোই বালাই ছিল না। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কত দীর্ঘ পরমায়ু নিয়েই যে ইনি এসেছেন, তা এঁর বিধাতা পুরুষ বলতে পারেন! এখনও নাকি ইনি আমার জন্যে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এ দিকে আমার যা চেহারা হয়েছে, তা নিজে দেখলেই ভয় পাই। পেট চলে না, তাই চাকরী করি।

চেহারা আমার যাই হোক্, মরণ যে শীঘ্র হবে না, এ কথা ঠিক। কতকাল যে সংসারের অসম পথে বিষম ধাক্কা আর হোঁচট খেতে খেতে এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝাটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে, কে জানে?—কিন্তু বেড়াব যে তার সম্বল কই? পিসীমা অনেক রকম চেষ্টা যত্ন

কান্নাকাটি করেও কিছুই করে উঠ্‌তে পারেন নি। ষোড়শীর অন্তিম অনুরোধ শত চেষ্টাতেও ত রাখতে পারলাম না। কেন? তা অন্তর্যামীই বলতে পারেন। তার খোঁপার ফুলটি তাই আর কারো খোঁপায় এ পর্য্যন্ত ওঠে নি। দেখি যদি সাম্‌নের এই দুর্গম পথে চল্‌তে চল্‌তে কখনো চোখে পড়ে তার মতন আর কেউ ত সেই দিন দেখবো, তারই মাথায় পরানো যায় কি না এই জীবন-ভার বয়ে বেড়ানো তুচ্ছ "খোঁপার ফুলটি।"

ভাড়াটীয়া

১

'আজও তোদের বাড়ীতে পেয়াদা এসেছিল কম্‌লি?' 'হাঁ বরেন্ বাবু।'

'রোজ রোজই পেয়াদা আসে কেন,—তাইত!'..... বলিতে বলিতেই কথাটার সুর ফিরাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা বল্‌তো কম্‌লি! তুই আমাকে বরেন্ দা না বলে বরেনবাবু বলিস্ কেন?' প্রশ্নের সঙ্গেই কমলাও বলিয়া বসিল, 'কেন, তাতে দোষটা কি বলুন?'

বরেন্ পাল্‌টা জবাব দিয়া বসিল, 'দোষ কিছু নেই—তবে কিনা শুন্‌তে কেমন যেন পর পর মনে হয়।'

'তা হোক্,—আপনারা হলেন বড় লোক, তা ছাড়া আপনি প্রায় বারো মাসই থাকেন বিদেশে। পূজোর কিম্বা গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী এলে ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়,—তাই আপনাকে একটা সম্পর্ক ধরে ডাকৃতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে।'

'বরং একটা সম্পর্ক না ধরে ডাকাতেই বাধ বাধ ঠেকবার কথা, কি বলিস্?' বলিয়াই বরেন্ তাহার মুখের একটু মাত্র উত্তরের আশায় তার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। কমলা ইহার প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বরেন্ সে কথা ফিরাইয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা তোর বাবার অসুখ আজকাল কেমন?'

কমলা সে কথায় একটুখানি অন্যমনস্কের মতন উত্তর করিল 'আপনি বরং গিয়ে দেখে আসবেন একবার।'

'হাঁ ঠিকই বলেছিস্! চল তবে, এখনই গিয়ে দেখে আসি।' কমলা কি ভাবিয়া জবাব করিল 'আপনি, বরং ওবেলা যাবেন বরেন বাবু!'

বরেন্ কথাটার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না সত্য, তবু কি ভাবিয়া কহিল, 'সেই ভাল কথা, ওবেলা যাবোখন।'

কমলাও বলিল, 'আচ্ছা মনে থাকে যেন, ভুলবেন না'—বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

২

বরেন্ ধনীর সন্তান। কলিকাতায় থাকিয়া বি-এ পড়ে। মতলব বি-এ পাশ করুক্, আর নাই করুক্, দেশে থাকিয়া সমাজ এবং পল্লী-সংস্কারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিবে। কমলা তাহাদেরই পাড়ার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে।

নিজেদের দুরবস্থার জন্যই হোক্, কিম্বা সঙ্কোচ বশতঃই হোক্, পাড়ার অপর পাঁচজন সমবয়সী ছেলে মেয়ের মতন সে ধনীপুত্র বরেন্দ্রকে বরেন্দা না বলিয়া বরেন্ বাবু বলিয়াই ডাকে। ইহার দরুণ সে নিজকে মনে মনে অপরাধীও যে না করিয়াছে এমন নয়। কেবলি ভয়, পাছে কে কখন কি বলিয়া বসে।

আজ যখন বরেন্ নিজেই কথাটা ধরিয়া ফেলিল, তখন তাহার আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই রহিলনা। কেবলি ভাবিতে লাগিল। অন্য কথা এখন চুলোয় যাক্, এঁর হাত থেকে একবার পালাতে পারলে বাঁচি। তাই বরেন্ যখন সেই দণ্ডেই তাহার পিতাকে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিল, তখন কি জানি কেমন একটা অজানা আতঙ্কে তাহার বুকটা দুর দুর করিতে লাগিল। কি জানি দু'জনকে এক সঙ্গে দেখিয়া,

বিশেষতঃ গ্রাম ভাল নয়, কে কি বলিবে, ইত্যাদি নানা কথাই তাহার মনের মধ্যে আসিয়া এক এক করিয়া উদয় হইতে লাগিল।

কমলার পিতা হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নৈকষ্য কুলীন। নিজে, স্ত্রী ও এই একটী মাত্র কন্যা কমলাকে লইয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসার। সম্পত্তির মধ্যে জোত ও ব্রহ্মোত্তর মিলাইয়া ২৫।৩০ বিঘা জমী, একটী মাঝারি রকমের পুকুর ও একটী ফলের বাগান।

হরকান্তের পিতা রমাকান্ত এই সম্পত্তির আয় হইতে বেশ স্বচ্ছন্দেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে জেদের বশে কোন দুর্দ্দান্ত লোকের সঙ্গে মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসেন। আসন্ন সর্ব্বনাশের মুখ হইতে যিনি আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন তিনি পাশের গ্রামের বলাই পোদ্দার। নষ্টপ্রায় সম্পত্তিটীকে রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া রমাকান্ত সর্ব্বনাশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন সত্য; কিন্তু একমাত্র পুত্রকে যে কোথায় রাখিয়া গেলেন, তাহা একবার তাকাইয়াও দেখিলেন না।

ইহার কিছুদিন বাদেই কলেরা তাঁহাকে চির নিষ্কৃতি দান করিল। কিন্তু যাহাদিগকে কার্পণ্য প্রকাশ করিল, তাহারাই রহিল সংসারের শত ঝঞ্ঝাপাত সহিবার জন্য।

* * * *

বলাই মাস মাস পেয়াদা পাঠাইয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কড়ায় গণ্ডায় সুদ আদায় করিয়া লইতেছে। এদিকে কোন কোন বৎসর হয় অতি বৃষ্টি নয় অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষই বল, বা তার ক্ষুদ্র সংস্করণ অনটনই বল, একটা না একটা লাগিয়াই আছে।

হরকান্তের সংসার একরূপ অচল বলিলেও হয়। গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করিয়া মাসে ৫৲ পান। ইহা বাদে যাজনিক ক্রিয়াও আছে,

তাহাতে বড় জোর ৫।৬ টাকা করিয়া আয় হয়। সম্প্রতি নিতান্ত অভাবে পড়িয়াই তাঁহাকে এই যাজনিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

কিন্তু অভাব যতই থাক্, কস্মিন্ কালেও তা'র দোহাই পাওনা দারের কাণে পৌঁছিবেনা,—বা অবিবাহিতা মেয়ের বয়সও তদ্দরুণ এক তিল কমিবেনা। ইহার উপর শ্যেন-চক্ষু সমাজের দৃষ্টি সর্ব্বত্র। শুধু তাই নয়, এমন একদল নিষ্কর্ম্মা লোক পল্লী গ্রামে দেখা যায়, যাহাদের কাজ কেবল পরচর্চ্চা, পরনিন্দা,—তাহাদের মুখ হইতে যে কথাটা একবার বাহির হয়, তাহাই গেজেট্ রূপিনী ঠান্‌দি, পিসীমাদের মহিমায় পল্লবিত হইয়া সারা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ইঁহাদেরই রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া সমাজের দলপতিরা অনেক সময় অনেকের বিরুদ্ধে এমন সব রায় দিয়া বসেন, যাহা একান্তই নীতি বিরুদ্ধ। তবুও সে রায় মাথা পাতিয়াই মানিয়া লইতে হয়, নচেৎ যে গত্যন্তর নাই।

হরকান্তের মনে এ সমস্ত চিন্তার বালাই এতদিন ছিল না—কিন্তু ক্রমাগত কয়েক মাস ধরিয়া শয্যাশায়ী থাকাতে চিন্তাটা এখন এমন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে, যে মুহূর্ত্তও আর তাঁহার মনে শান্তি বলিতে কিছুই নাই।

৩

'হরকান্ত কাকা কেমন আছেন? শুন্‌লাম আপনার বড় অসুখ।'

'কে বাবা! ভাল করে ত তোমাকে চিন্‌তে পাচ্ছিনে'।

'আমি বরেন্! কেন কমলা আমার কথা বলেনি আপনাকে? কি কমলা?'—বলিয়াই পার্শ্ববর্ত্তিনী কমলার পানে তাকাইতেই সে মাথা হেট করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

ধনী পুত্র বরেনের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে সত্য সত্যই হরকান্তের আজ আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নিজের যে অসুখ, সে কথাটা তিনি ভুলিয়াই গেলেন ; আনন্দের আতিশয্যে একরূপ আত্মহারা হইয়া সুস্থ সবল লোকের ন্যায় তড়াক্ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

'করেন কি, করেন কি মাথা ঘুরবে, শুয়ে পড়ুন!' বলিয়া বরেন্ একরূপ জোর করিয়াই তাঁহাকে শোওয়াইয়া দিল।

হঠাৎ ওঠাতে, এবং জোর করিয়া শোওয়ানোতে হরকান্ত একটুখানি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায়ই ঝিমাইতে ঝিমাইতে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিলেন, 'যদিও কপাল গুণে গরীবের দোরে চাঁদের আলো ফুটেছে ত, আশা করি বঞ্চিত হই না যেন।'

'ও কি বল্ছেন কাকা-মহাশয়। আমাকে কি পর মনে করেন?'

তাতো করিনে বাবা! তবে কিনা, তোমরা হ'লে কত মস্ত বড় লোক। বল্‌তে কি আমি ত তোমাদের তুলনায় সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ বিশেষ।' হরকান্ত আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বরেন্ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, 'সত্যিই কাকা ; নিজেকে অত ছোট মনে করবেন না। এক জনের দু'টো পয়সা থাক্‌লেই সে কখনো বড় লোক হয় না। সংসারে ধর্‌তে গেলে মানুষ মাত্রেই সমান।'

হরকান্ত একটুখানি বিষাদের সুরে কহিলেন, 'তা হয়না বাবা! সংসারে প্রতিদিন যা সত্যি বলে দেখ্‌তে পাচ্ছি, মেনেও নিচ্ছি, সেটাকে অস্বীকার করতে গেলে যে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হবে। বেশ দেখা যাচ্ছে, যার পয়সা আছে, তাকেই পাঁচজনে বড় লোক বলে মেনে নিচ্ছে, আমার ত মনে হয়, তারা এতে করে এতটুকুও ভুল করে না। কেননা সংসারে থাক্‌তে গেলে পয়সার দরকার সকলের আগে। যার নাই, তাকে যে বাধ্য হয়ে ধনীর দোরে হাত পাত্‌তে হয়। এরূপ নিদর্শনও ত বড়

বিরল নয়, সুতরাং যে ভিক্ষোপজীবী সে নিশ্চয়ই ছোট—তার এ সংসারে থাকা না থাকা দুইই তুল্য।'...বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ও শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। বরেন্ ইহা লক্ষ্য করিয়া দুই হাত যোড় করিয়া তাঁহার সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল 'ছি! সামান্য কারণে অত উতলা হতে নেই!'

'সামান্য কারণ কি বোল্‌ছ বাপু! আমার মেয়েটাকে ত দেখেছ!' বলিতেই বরেনের চোক মুখ কেমন যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। একটু খানি থামিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—'দেখেছি বই কি! বল্‌লামই ত আজও ওর সঙ্গে আমার দেখা।' 'যদ্দূর মনে পড়ে! কই এ কথা ত আমাকে বলেনি বাবা!' বলিয়াই তিনি একটুখানি উঁচু গলা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন 'আরে ও কম্‌লি কমলি! আঃ মোলো! মেয়েটার আবার কি হল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমনি কোথায় গিয়ে উধাও হ'ল।'

'মেয়েটার কিছু হয়নি যা হবার তা হয়েছে আমাদেরি এই পোড়া কপালের—গরীবের ঘরে কেনই বা মেয়ে হয়।'

—বলিতে বলিতে হরকান্তের স্ত্রী বিরজাসুন্দরী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সম্মুখেই বরেন্‌কে দেখিয়া একটুখানি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। থতমত খাইয়া মাথার উপর ঘোম্‌টাটা আরেকটুখানি টানিয়া দিয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে বরেন্‌কেই লক্ষ্য করিয়া বেশ স্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'ছাখ বাবা, গরীব বলে কি আমাদের কুঁড়ে পেতে বাস করতে দেবেনা?'

কথাটায় উভয়েই যেন চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা কাহারও বোধগম্য হইলনা। বরেন্ নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বিরজাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'খুড়ীমা! অপরাধটা আমার, না আমার বাবার? বাবার হলে তার প্রতীকার আমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব, কিন্তু আমার হলে প্রতীকারের চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই কোরব।'

বিরজাসুন্দরী এবারেও পূর্ব্বের মতনই স্বাভাবিক ভাবে বলিলেন, 'অপরাধের কথা বল্‌ছিনে বাবা, তবে কথাটা তোমার সম্বন্ধেই। আমরা নিতান্ত গরীব তায় ঘরে সোমত্ত মেয়ে, তার সঙ্গে পথে-ঘাটে কথাবার্ত্তা বলা দোষের না হতে পারে, কিন্তু মানুষের ত চোখ কাণ আছে বাবা।'

বরেন্ সহাস্যে উত্তর করিল, 'এই কথা খুড়ীমা! তবে শুনুন'—বলিয়া কমলার সহিত তার সকাল-বেলায় কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

হরকান্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন 'এইত কথা, এতেই এত উতলা হবার কি আছে?'

'উতলা আমি এতটুকুও হয়নি। মা হয়ে যদি নিজের মেয়েকে চিন্‌তে না পেরে থাকি ত অমন মেয়ে মিছেই পেটে ধরেছি। আর এই এক ভদ্রলোকের ছেলেকেও ত জানি, যাকে—সাম্‌নে বল্‌লে হয়ত খোসামোদ করা হবে—গ্রামের দশজনে কি ধন্যি ধন্যি সুখ্যাতিই করে! তবে কথা হয়েছে কি, ওই ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো, যার তিনকুলে কেউ নেই, সেই পদ্মপিসী একটুখানি আগে এসে এক ভরা নিন্দের বিষ ঢেলে গেল। গরীবের দোরে শুভাগমন, দেখেই বুঝতে পেরেছি, যে এ শুভাগমনের বিশেষ মানে আছে। তক্ষুনি আমার বুক্‌টা ধড়ফড়িয়ে উঠেছে। ওমা! হোলোও তাই। যেম্‌নি মার মার করে আসা, কি অমনি গড় গড় করে কি যে মাথা মুণ্ডু বকে গেল, তা বুঝতেই পারা গেল না। কেবলি ভয় হচ্ছে, পদ্মপিসীর মুখ থেকে যখন এ বিষ বের হয়েছে, তখন ধ'রে রাখো, গাঁময় এ না ছড়িয়ে যাচ্ছে না।'

বরেন্ ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় মাটীর সঙ্গে যেন মিশিয়া যাইতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল 'ছি ছি কি লজ্জা!' হরকান্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এবারে উত্তেজিত স্বরে বলিয়া

উঠিলেন, দেশে এত মড়ক মহামারী থাকতে হারামজাদীর কিছু হয়না গা! এমনি প্রমাই ওর!" পরে বরেনের হাত দুইখানি ধরিয়া গলদশ্রুনেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বাবা! বড়ই অসময়ে আমাকে দেখতে এসেছ। ভাবী বিপদে তুমিই একমাত্র আমার বল ভরসা।' বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল। বরেন্ আর এ দৃশ্য দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলনা, উভয়কে সান্ত্বনা দিয়া প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় হইল।

৪

একদিন আষাঢ় মাসের আসন্ন বর্ষার দিনে সন্ধ্যা বেলায় হরকান্ত যেন কোথা হইতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া উঠানের মাঝখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। টের পাইয়া বিরজাসুন্দরী ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রথমটা তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা সরিল না। কিন্তু তাঁহার চোখে মুখে একটা আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অমন কর্চ্ছ কেন?...কোথায় গেছলে?'

'ব্যস্ত হোয়োনা। আমার তেমন বিশেষ কিছু হয়নি! একটা মানসিক উত্তেজনা মাত্র। চলো, ঘরের দাওয়ায় গিয়ে আস্তে আস্তে বলিগে।'—বলিয়াই তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিলেন। পরে বিরজাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কমলা কোথায়?'

'ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাদীপ দিতে গেছে। কেন, তাকে কেন?'

'কোন দরকার নেই' বলিয়াই কি যেন চাপিয়া গেলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া বিরজাসুন্দরী প্রশ্ন করিলেন, 'আজ বুঝি, স্পষ্ট জবাব পেয়ে এলে?'

'আর বলো কেন বিরজা! জানো তারা কত বড় লোক?'

'সেই কথাটাই বুঝি মুখের উপরে বল্‌লে?'

'নয় ত কি! বল্‌লে বামন হয়ে চাঁদে হাত হরকান্ত!'

'হায়রে মরণ দশা!……নয় বাপু দু'টো পয়সাই নাড়াচাড়া কচ্ছিস্‌, তাই বলেত আর তুই কুলীন সমাজের মাথা নোস্‌। কুলে-শীলে কোথায় আমি, আর কোথায় তুই! পয়সা নাই বলেইত তোর মতন নীচ ঘরে কাজ কর্ত্তে গেছ্‌লাম! আর আমার মেয়েটাই কি বাপু ফেল্‌বার মতন রে! তোর ওই মুখুয্যে গুষ্ঠীর যা ছিরি, তা আর বলে কাজ নেই। ছেলেটাকে বাদ দিলে মেয়েগুলো যেন হুবহু শ্মশান-কালীর বাচ্চা। যাঃ! ছোট লোক—ইতর কোথাকার!'

'বরেন্‌ যে এত করে আমাদের খোঁজ খবর নিলে, এত আশা ভরসা দিলে, সে এখন কি বলে?'

"আর বল্‌বার সাধ্য কি তার? এই হারামজাদী পদ্ম ঠাকুরুণ ওর বাপ বেটার কাছে গিয়ে নানারকম করে লাগিয়েছে। বলেছে ওই ধেড়ে মেয়েটার সঙ্গে একবার তোমার ছেলে যদি মজে যায়ত আর ফেরাতে পারবেনা।"

"শোন একবার ঘেন্নার কথা—'যদি মজে যায়!—আ-মর্‌ শতেকখাকী মজতে হয় তুই যা—না! যার সাথে তোর সাধ হয় তার সাথে মজগে যা। হারামজাদী নচ্ছার কোথাকার! ইচ্ছে করে খেংরিয়ে একবার বিষ ঝেড়ে দি,—তবে বুঝি গায়ের ঝাল মেটে!"….. বলিয়া বিরজাসুন্দরী কেবল একটা নিস্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিলেন।

হরকান্ত শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "অত উতলা হোয়োনা, বিরজা! আমাদের অদৃষ্টের দোষ নইলে এমন হবে কেন বলত? বরেন্‌ ছেলেটাকে আমি এতটুকুও দোষ দিইনে। সে কমলাকে বিয়ে করার কথা বাপের

কাছে তুল্‌তেই চামারটা তাকে হাতে ধরে মারতে বাকী রেখেছে। পদ্মর মুখে আগে থেকেই শুনে, সে কেবল তাক্ করে ছিল, ছেলে তাকে কিছু বলে কিনা। যেমন শোনা কি, তাকে বাড়ী থেকে দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিয়েছে—আরও শাসিয়েছে কি বলে জানো' হোক্ না একমাত্র বংশধর, তবু কথার অবাধ্য হলে তাকে তেজ্য পুত্র কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হবার নয়, এই নরেন্ মুখুয্যে।'

"তবেত বাহাদুর বল্‌তে হবে এমন লোককে!"

'তা আর নয়!,

'কিন্তু এখন উপায়?

'উপায়—মনে কর তোমার মেয়ে বাল-বিধবা!'

'ছিঃ অমন অলুক্ষণে কথা বলতে নেই!'

"অলক্ষুণে কথা কি আর সাধে বলি বিরজা! ধর বিয়ে দিতে না পারলে অবস্থা যে সমান দাঁড়াবে, তা একবার ভেবে দেখেছ?"

বিরজাসুন্দরী কি একটা উত্তর দেবেন, এমন সময়ে কমলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোধ হয় আড়ালে থাকিয়া সে পিতামাতার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল, তাই অসমাপ্ত কথার মাঝখানে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "বাবা! নিজের শরীরের দিকে একবারটীও তাকাও না। কেবল আমার জন্যেই তোমার যত কষ্ট। তোমার দু'টী পায়ে পড়ি বাবা, আর রোজ রোজ অমন করে অপমানের বোঝা মাথায় করে বয়ে এনোনা।"

কমলার বেদনা-পাণ্ডুর মুখখানি নিজের ক্রোড়ের মধ্যে লইয়া হরকান্ত বলিতে লাগিলেন, 'হাঁরে তোর এই মুখখানির কাছে কি দুনিয়ার ধন দৌলৎরে!……নরেনের ওপর আমার বড়ই আশা ভরসা ছিল।'

"তাতো ছিল বাবা! এখন চুপ কর"—বলিয়া কমলা নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। বহুক্ষণ যাবৎ এই ব্যথিত ক্লিষ্ট দরিদ্র দম্পতী ছায়া-মূর্ত্তির মতন সেই অন্ধকারে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন নির্ব্বাক নিস্পন্দ নিশ্চল যেন প্রাণহীন।



তিন বৎসর পরের কথা। কালীঘাটে মায়ের মন্দির হইতে একটুখানি দূরে একখানি খোলার ঘরে দুইটী বিধবা বাস করে। ইহারা সম্পর্কে মা ও মেয়ে। জীবিকার্জ্জনের কোন ধরাবাঁধা উপায় না থাকাতে কখন কখন গৃহস্থ বাটীতে পাচিকাবৃত্তি করিয়া দু পয়সা আনে, কখন বা পৈতা কাটিয়া, মুড়ি ভাজিয়া, ডালের বড়ি বিক্রী করিয়াও কিছু সংগ্রহ করে, আর অবসর সময়ে উলের আসন বুনিয়া ঠিকাদারে বেচিয়া যাহা পায়, তাহাতেই মনে করে মস্ত লাভ। এইরূপ করিয়াই ইহাদের দিন কাটে। মেয়েটীর বয়স আঠার উনিশ হইবে। বৈধব্য-ক্লিষ্ট, তথাপি সর্ব্বাঙ্গে যেন যৌবনের জোয়ার উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে।

সকাল বেলায় মেয়ে ঘুম হইতে উঠিয়া মাকে বলিল, 'মা! আজ না বাবার বছুরকী তিথি! তবে অমন চুপ করে বসে রয়েছ যে! কি কর্‌তে হবে আমাকে বল। একটা পুরুতও ত চাই।'

মাতা গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ মেয়ের অনুযোগে একটুখানি চমকিয়া উঠিলেন। তিথির কথাটা তাঁহারও মনে ছিল এবং তজ্জন্য সাধ্যানুযায়ী একটু আয়োজনও যে না করিয়াছিলেন, এমন নয়। পুরোহিতও ঠিক করাই আছে। তিনি যে বাড়ীতে রান্না করিয়া থাকেন, সেই বাড়ীর পূজারী ঠাকুরকে তিনি আগে হইতেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু চিন্তাটা সে জন্য নয়। চিন্তাটা অন্য কারণে। গত কল্য সন্ধ্যার সময় বাড়ীওয়ালার কর্ম্মচারী আসিয়া জানাইয়া গেছে যে আগামী মাসের ১লা থেকে বাড়ীর নূতন মালিক ৩৲ টাকার স্থলে মাসিক ৫৲ টাকা ভাড়া আদায় করিবেন। কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে মনিবের কাছে গিয়া এতেলা করিতে পারেন, কিম্বা খুসী হইলে বাড়ী ছাড়িয়া দিতে পারেন। তিন দিনের মধ্যে একটা জবাব না পাওয়া গেলে মালিক আইনতঃ এই নির্দ্ধারিত ভাড়া আদায় করিয়া লইবেন।

এই পরোয়ানা পাইয়াই মাতার মনে আর উদ্বেগের সীমা ছিল না। মেয়ে তখন পাশের বাড়ীর একটী সমবয়সী মেয়েকে কার্পেট বোনা শিখাইতে গিয়াছিল। সে যখন ফিরিয়া আসে, তখন তিনি বহু কষ্টে এই দুঃসংবাদটা চাপিয়া গিয়াছিলেন। আজ সকাল বেলা থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাটাই কেবল তাঁহার মনের মধ্যে পাক দিয়া উঠিতেছিল। মনে পড়িতেছিল এক বেচারী এই সংসারে কি না কষ্টই করিয়া গিয়াছে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ভদ্রাসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া এই কালীঘাটে আসিয়া দুঃখময় জীবনের দিনগুলি যেন কতকটা স্বেচ্ছায়ই কমাইয়া ফেলিয়াছিল। আজ তাহার বাৎসরিক তিথি শ্রাদ্ধের দিন। আশা ছিল মা, ও মেয়ের কষ্টার্থিক সঞ্চয় হইতে ক্রিয়াটী সমাধা করিয়া কালীঘাটের কাঙ্গালীদিগকে দু এক পয়সা করিয়া যথাসাধ্য দান করিবেন। ভগবান তাহাতেও বাদ সাধিলেন। এখন ন্যায্য কাজটী কোনও মতে সাঙ্গ করিতে পারিলেই বাঁচা যায়।

ক্ষণকাল পরে মেয়ের কথায় মা জবাব করিলেন, "বেশী কি কোরব কমলি বলতো! কাঙ্গালী বিদায় হবে না। কেন না এখান থেকে আমাদের উঠতে হবে।" বলিয়াই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত ব্যগ্রদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া কল্যকার সমস্ত ব্যাপার বলিয়া ফেলিলেন।

কমলা কথাগুলি আগাগোড়া শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, দু'টো টাকা ত! তা এক রকম করে দেওয়া যাবে। নাই যদি যায় ত অগত্যা ঘর ছাড়তে হবে। তা যা হয় হবে, আজকের কাজ ত হয়ে যাক!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

কমলাদের গত তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

যেদিন কমলার দরিদ্র পিতা দুর্ব্বহ অপমানের বোঝা মাথায় করিয়া ধন-গর্ব্বিত নরেন্দ্র-নারায়ণের গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসেন, সেদিনকার অপমানটা তীব্র হইলেও তিনি তখন লুপ্ত স্বাস্থ্য কতকটা ফিরিয়া পাইয়াছেন, সুতরাং একরূপ দুঃখে কষ্টে চলিয়া ফিরিয়া সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু কন্যাদায় ও দেনা এই দু'টার চিন্তাই দিনের পর দিন তাঁহার পক্ষে সাংঘাতিক হইতে থাকে।

অবশেষে সত্য সত্যই যেদিন চামার বলাই পাওনা টাকার দাবী কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া শুধু তমসুক খানা ফিরাইয়া দিয়া গেল, সেদিন ওই মাথা ছেঁড়া কাগজখানা বাদে বাড়ী ঘর সম্পত্তি বলিতে তাঁহার কিছুই রহিল না। মানুষের জীবনে ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নাই। ভরসার মধ্যে ছিল এক দূর সম্পর্কীয় শ্যালক। সে কালীঘাটে থাকিয়া কথকতা করিয়া দু পয়সা রোজগার করিত। অগত্যা তাহাকে চিঠি পত্র লিখিয়া একমাত্র তাহারই ভরসায় তিনি স্ত্রী কন্যাসহ স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া পাঁচজনের পরামর্শে বিশেষতঃ কতকটা দেখা দেখিও কমলাকে মায়ের মন্দিরে কুমারী করিয়া দিলেন। সে সেখানে যাত্রিদের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া রোজ দু চার আনা করিয়া আনিতে লাগিল। নিজে গৃহস্থের বাড়ীতে এবং গঙ্গার ঘাটে পৌরোহিত্য করিয়া মাসে দশ পনর টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে বিরজা-সুন্দরীও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না।

তিনিও পৈতা বেচিয়া, মুড়ি, মুড়কি, ডালের বড়ি জোগান দিয়া মাসে অমন চার পাঁচ টাকা আয় করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এরূপ ভাবে তাঁহাদের বেশী দিন গেল না। কমলা একে সুন্দরী, তায় অপর পাঁচটী মেয়ের চেয়ে বয়সেও বড়। তাই ভিড়ের মধ্যে ফুলের মালা বেচিয়া বেড়াইবার সময় যে দুই একজন যুবকের লুব্ধদৃষ্টি তাহার উপর না পড়িল, এমন নয়। একদিন এই রকমেই একজন যুবকের গলায় যেমনি সে মালা পরাইতে অগ্রসর হইয়াছে অমনি সেই অশিষ্ট যুবকটী নির্লজ্জের মতন তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বিদ্রূপের ভরে বলিয়া উঠিল, 'এ ভিড়ের ভেতরে আর মাল্যদান কেন?' বলিতে কি, কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই কমলার সর্ব্বাঙ্গ যেন তড়িতাহতের মতন নিঃসাড় হইয়া আসিল। সেই অবস্থায়ই একজন বয়স্ক পূজারী ব্রাহ্মণ আসিয়া এক প্রচণ্ড গলাধাক্কা দিয়া সেই ইতর যুবককে ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিয়া মুহ্যমানা কমলাকে উদ্ধার করিয়া তখনই তাহাদের বাড়ী পৌছাইয়া দিলেন।

এই লোকটির নিবাস বর্দ্ধমান অঞ্চলে। ফুলেমেলের নৈকষ্য কুলীন, হরকান্তদের স্বঘর, আজ দশ বার বৎসর যাবৎ লোকটী বিপত্নীক। বর্ত্তমানে সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। বয়স অন্যূন চল্লিশ বেয়াল্লিশ হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই হরকান্ত কমলাকে ইহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কিন্তু যেমনি অদৃষ্ট, বিবাহের ছয়টী মাসও গেল না, কমলা বিধবা হইল। ইহার পর হরকান্ত আর একটী মাত্র বৎসর জীবিত ছিলেন।

ওদিকে এই কয় বৎসরে বরেনদের আরও বাড়বাড়ন্ত হইয়াছে। তাহাদের আড়ৎদারী কারবার কলিকাতা, বেলেঘাটা, চেৎলা, কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্মৃতি লাভ করিয়াছে।

৬

স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ বেশ নির্ব্বিঘ্নেই সমাধা হইয়া গিয়াছে। সাধ্যমত দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায়ও হইয়াছে। সন্ধ্যার পর বিরজাসুন্দরী কমলাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'এখন একটুখানি গড়িয়ে নে। আহা সারাটা দিন কি মেহনৎটাই গেছে তোর একার ওপর দিয়ে।'

কমলা মায়ের এই সস্নেহ উক্তিতে ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাবার কাজই ত! এতে কি আর মেহনতের কথা মনে আছে! আর এ কি-ই বা মেহেনৎ! হ'ত যদি আমাদের তেমন অদৃষ্ট ত, মেহনতের কথাই ছিলনা—' বলিয়া যে কথাটা শেষ করিল, ঠিক সেই কথাটাই তখন বিরজাসুন্দরীরও মনের মধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। তবে তিনি বহু কষ্টে সেটাকে চাপিয়া গিয়া একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন মাত্র। কিন্তু তাঁহার মন আজ কিছুতেই শান্ত হইতে পারিলনা। অনবরত ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অতীতের পানে ধাওয়া করিতে লাগিল। সেই দেশের পল্লী কুটির, সেই সাংসারিক দুরবস্থার চিত্র, স্বামীর পীড়া, দেশত্যাগ, পরে এই জীর্ণ কুটীরে বসবাস, কমলার বিবাহ, বৈধব্য, পরে এই বিদেশে সেই শোক দারিদ্র্য ক্লিষ্ট স্বামীর একরূপ অনাহার অচিকিৎসায় মৃত্যু··· ···বিরজাসুন্দরীর আর সহ্য হইলনা, তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া বড় বড় কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আসিয়া কমলার মুখের উপর পতিত হইল। কমলা মায়ের চোখ দু'টী মুছাইয়া দিয়া কহিল 'থাক, কেঁদোনা মা।·· একটুখানি চুপ করো' বলিতে বলিতে নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল। মাতা নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন, 'মানুষ আশা করে এক, ফল হয় অন্যরূপ। নেহাৎ

কপালের লেখা তাই একটার পর একটা করে এত সব ভোগান্তি আমাদের হচ্ছে। তাই যদি না হবে ত তোরি বা এমন করে কপাল পুড়ে যাবে কেন? কপালে সুখ থাক্‌লে বরেন্‌কেই পাওয়া যেত। সে ত ষেটের কোলে দিব্যি বেঁচে আছে। শোনা যায় এই কালীঘাট অঞ্চলেও নাকি তাদের কারবার বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে।' কমলার কাছে এসব প্রসঙ্গ একটুও ভাল লাগিতে ছিলনা। সে মাতাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে না শুনি না শুনি করিয়া কহিল, 'আচ্ছা মা! বলাই পোদ্দারটা বাইরে কি সাধু-গিরি ফলায়, কিন্তু আসলে হদ্দ চামার—নয় কি? কেমন করে আমাদের হাড় মাসে চিবিয়ে খেয়ে শেষ কর্‌লে।'

"যেমন কর্ম্ম করেছিলাম পূর্ব্ব জন্মে, তার ফল ত ভুগতে হবে। নইলে শাস্ত্র মিথ্যা, হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা।" বলিতে বলিতে তিনি চুপ করিয়া গেলেন। কমলাও কত কি ছাই ভস্ম, তার না আছে কূল না আছে কিনারা ভাবিতে ভাবিতে চুপ করিল সত্য, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মানসপটে কেবলি এই নিরীহ বেচারীর ছবিখানি উদিত হইতে লাগিল। তাহাকে সে কোনদিন ভালবাসিয়াছে কিনা, জানেনা, কিন্তু পরম আত্মীয় জ্ঞানে বরাবরই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। আজ মাতার মুখে তাহার কথা শুনিয়া অবধি তাহার বুকের মধ্যে যেন কেবলি হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল, তাই মাতাকে কোনও মতে নিরস্ত করিয়া দিয়া সে কেবলি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিল 'সত্য সত্যই কি নিরপরাধজনক বিনা দোষে শাস্তি দিতে গেলে, সে শাস্তিটা নিজেকে পেতে হয়না? প্রশ্নের সঙ্গে নিজেই মনে মনে বলিয়া উঠিল "পেতে হয় বই কি! নিশ্চয়ই পেতে হয়। আর এই পাওয়াটাই হচ্ছে সত্যিকার পাওয়া—দুঃখ দুর্গতি মানুষের জন্যেই আছে। তবে কারও কম, কারও বেশী কেন?" এ প্রশ্নের সমাধান আর তাহার মনে জোগাইল না। কেবলি থাকিয়া থাকিয়া

আজ একটী কথাই তাহার মর্ম্মস্থানে বিষাক্ত সূচিবদ্ধ করিতে লাগিল। তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই কথা, দাম্ভিক পিতার দুর্ব্যবহারের জন্য নিরপরাধ বরেনকে কঠোর উক্তি। সে দিন সে স্পষ্টই বলিয়াছিল, "আপনার বাবা বড় লোক বলে আমার গরীব বাপকে যে অপমান করেছেন বরেন্ বাবু! সেটা কি এত সহজেই ভোল্‌বার কথা!" বরেন্ যেন এ কথার প্রত্যুত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরস্ত করিয়া জবাব করিয়াছিল "হতে পারে আপনি মহৎ, কিন্তু আমরা গরীব ব'লে আপনাদের যে ঘৃণার পরিচয় পাওয়া গেছে, তা এ জীবনেও ভোল্‌বার কথা নয়।"

বরেন্ সেদিন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিয়াছিল "সে জন্য আমি মাফ্ চাচ্ছি কমলা!"

সেও কাঁদ কাঁদ স্বরে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল "সে হয় না বরেন্ বাবু! আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমাদের সমাজটা হিন্দু সমাজ, আর আমি একজন গরীব পুরুত-বামুনের মেয়ে। আপনারা বড় লোক, সমাজকে না মান্‌তে পারেন, কিন্তু আমরা সমাজকে বড় ডরাই। বিশেষতঃ আমরা মা বাপকে আমি ত দেবতার মতন মনে করি" বলিয়া সে বরেনকে বিদায় দিয়াছিল। অবশেষে চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

৭

'হ্যাঁ মা অমন কচ্ছ যে?' সকাল বেলা নিদ্রাভঙ্গ হইতেই কমলা মাতাকে এইরূপ প্রশ্ন করিল।

"আমার মাথাটা বড্ডই কন্ কন্ কচ্ছেরে কমলি!"

"মাথা কন্ কন্ কচ্ছে! তবে বুঝি জ্বর হয়েছে?"······

"নারে জ্বর না আধ-কপালী।"

কমলা মায়ের কপালে হাত দিয়াই চমকাইয়া উঠিল,—বলিল "আধ কপালী না আরো কিছু! জ্বরের তাতে যে মাথা কপাল ফেটে পড়ছে। গায়েও যেন খই ফুট্‌ছে।"

এমন সময় বাইরের দরজায় আসিয়া কে হাঁকিল "কে কে ভাড়াটে আছো, আজকের দিনের মধ্যে মনির বাড়ীতে গিয়ে যার যা বল্‌বার থাকে, বলে ভাড়ার বন্দোবস্ত করে এসো। নইলে বেশী ভাড়া সাম্‌নের মাস থেকে দিতে হবে।"

জ্বরের ঘোরেই বিরজাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন "ওইরে সেই মিন্সে এসেছেরে কমলি! একবার বাইরে গিয়ে ত্থাখ তো!" কমলা মায়ের আকস্মিক অসুখে মনে মনে ভারী একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গিয়া দরজার চৌকাঠের কাছ থেকেই উদ্দেশ করিয়া লোকটাকে কহিল, "আমরা মেয়ে মানুষ হয়ে কখনো পুরুষের দরবারে যাইনে। যাও! বাসায় অসুখ, আর বেশী কথা বল্‌বার আমার ফুরসুৎ নেই। যদি বেশী ভাড়া আদায় করতে হয় ত, তোমাদের মালিককে একবার এসে সরেজমীনে সব দেখে যেতে বোলো।"

যে লোকটী আসিয়াছিল সে বর্ত্তমান গৃহ-স্বামীর নূতন কর্ম্মচারী—

বয়স অনুমান ৩০।৩২। অস্ফুষ্টস্বরে লোকটী কমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "বাপরে! জাঁদরেল মেয়ে-মানুষ! মনিব একবার এলেই সব বোঝা পড়া হতে পারবে। চাই কি ভাড়া মকুবও হতে পারে।"

কমলার মাতার অসুখ ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল। এমন কেহ জানা নাই যাহাকে বলিয়া কহিয়া ডাক্তার ডাকাইতে পারে। অগত্যা সারা রাত্রি ধরিয়া কেবল ঘর বাহির করিতে লাগিল। বিরজাসুন্দরীর জ্বরের মুখেই বিকার দেখা দিয়াছিল। সেই বিকারের ঘোরেই বলিতে লাগিলেন, "ওরে বেশী ভাড়া দিতে হবে, বেশী ভাড়া দিতে হবেরে কমলি! এখুনি ঘর ছেড়ে দে, চল্ পালিয়ে যাই।" এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে ভোরের সময় জ্বরও ছাড়িয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রলাপ বকাও চির দিনের জন্য বন্ধ হইল। স্বামী বিয়োগের ঠিক এক বৎসর পরেই সাধ্বী তাঁহার অনুগমন করিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে দুই একটী প্রতিবেশিনীর সহিত সে একত্রে বসিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। এমন সময় কে আসিয়া দরজায় হাঁকিল "কে আছো বাইরে এসো।" ক্রমাগত অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করিয়া কমলার প্রকৃতি কেমন উগ্র হইয়া গিয়াছিল। ইহার উপর এই আকস্মিক মাতৃবিয়োগে সে যে কেবল নিজের দুরদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতেছিল, এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-সংসারকেই গালি দিতেছিল। তাই কতকটা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়াই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আগন্তুক যখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল "সকলেই বেশী ভাড়া দিতে রাজী হয়েছেন। আপনার যদি কিছু বল্‌বার থাকে ত বলুন। নইলে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ঘর ছেড়ে দিতে হবে।" এ কণ্ঠস্বর যে তার পরিচিত। হায় ভগবান! এ কি তোমার লীলা রহস্য! যাহাকে একদিন জোর করিয়াই ভুলিবার জন্য সে তার নিবেদিত অর্ঘ্য

হেলায় অগ্রাহ্য করিয়াছে আজ যে সেই আবার এক নূতন মূর্ত্তিতে তাহারই কাছে আসিয়া উপস্থিত! অবগুণ্ঠনটী উন্মোচন করিয়া একবার সে আগন্তুকের মুখের পানে তাকাইয়া তড়িচ্চকিতার ন্যায় এক পা পিছাইয়া আসিল।

"কে? কমলা?" বলিয়া যে লোকটী তাহাকে সম্বোধন করিল, সে বরেন্।

'হাঁ বরেন্ বাবু! আমি কমলা' বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, বরেন্ তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল 'দাঁড়াও!' তারপর মুহূর্ত্ত মাত্র তার পানে পলক ফিরাইয়াই ব্যথিত স্বরে কহিল "এ কি দেখ্‌চি কমলা!······সত্যই কি·········?"

অবিকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল "হাঁ বরেন্ বাবু! আমি বিধবা।"

"কত দিন হল?"

"বছর দেড়েক হবে।"

"কাকা কোথায়?"

কমলার মুখখানা সহসা ছাইয়ের মতন শাদা হইয়া গেল। নীরবে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া একবার তাকাইল মাত্র।

'খুড়ীমা?'

'মাও নেই বরেন্ বাবু! গত কাল তিনি আমার মায়া কাটিয়ে গেছেন' বলিয়া সদ্য মৃতা মাতার শোকে সে ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

'ওঃ! তাই বুঝি আমার কর্ম্মচারী বল্‌ছিল যে একটা বাসায় অসুখ। হায়! হায়! এ যে তোমরা তাতো জান্‌তাম না। কমলা! এখন কি করবে?' অন্যমনস্কের মতন কমলা উত্তর করিল 'তা বলতে পারিনে'।

'একটা অনুরোধ রাখবে কি ? এমন দুঃসময়ে যদি কিছু মনে না করত, আমার মস্ত সংসার পড়ে রয়েছে……'

বাধা দিয়া সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "কে কে আছেন আপনার সংসারে ?"

এবারে বরেন্ একটুখানি গোলে পড়িল, তবু সত্য কথা না বলিয়া পারিল না "মা—বাবা কাশীতে। আমি এখনও ঘর-সংসার করিনি। তবে লোকজন চাকর-বাকর সবই আছে।"

কমলা এবারে মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে জবাব করিল 'একদিন সঙ্গত অনুরোধ করে আমাকে পান্‌নি বলে, আজ অসহায় ভেবে, অন্যায় অনুরোধ করতে এসেছেন আমাকে পাবার জন্যে! ভুল! যদি অনুগ্রহই মনে করেন ত, আপনার এ অনুগ্রহ ফিরিয়ে নিয়ে যান। প্রাণ গেলেও আমি আপনার কোন অনুগ্রহ পেতে চাই নে, তা আপনি যত বড় মহৎই হন্ না কেন। এতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে ত মাফ্ করবেন,' বলিয়াই কোনও মতে আসন্ন অশ্রু প্রবাহকে বাধা দিয়া ছুটিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ করিয়া দরজাটাও বন্ধ হইয়া গেল।

বরেনের মুখ হইতে আর কথা সরিল না। স্তম্ভিতের ন্যায় ক্ষণকাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি চিন্তা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কমলা রাত্রেই ঠিক করিয়া ফেলিল, সে দেশে স্বামীর পল্লী কুটীরে গিয়া দুঃখে কষ্টে যে ভাবে হোক্ পুত্রহারা বৃদ্ধা বিধবা শ্বাশুড়ীর সেবা করিয়া জীবন কাটাইয়া দিবে। তাই ভোর হইবার পূর্ব্বেই আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র গুছাইয়া বাঁধা-ছাঁদা শেষ করিয়া লইল। সঙ্গে যাইবার জন্য পার্শ্বের বাড়ীর একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে কিছু পয়সা কড়ি দিবার

প্রস্তাব করিতেই সেও রাজী হইল। পরে পূর্ব্বাকাশ যখন একটুখানি পরিষ্কার হইবার মতন দেখা গেল, তখন একখানি গাড়ী করিয়া উভয়ে হাওড়া ষ্টেশন মুখো রওনা দিল।

পর দিন বরেন্ নিজেই যখন আবার আসিল, শুনিতে পাইল অতি প্রত্যুষেই এ ঘরের ভাড়াটে ঘর ছাড়িয়া কোথায় যেন উঠিয়া গিয়াছে।

প্রজা মনিব

১

স্বরূপ চাষার ছেলে। তাহার পিতার আমলের যা কিছু জমী-জমা ছিল, শারীরিক পরিশ্রমে তারই উপস্বত্ব হইতে কোনো রকমে কায়ক্লেশে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল! সংসারও খুবই ছোট, স্ত্রী আর সে। কিন্তু ছোট হইলেও ক্রমে এই সংসারটী অভাবে পড়িয়া অচল হইবার মত হইল। দুই বৎসর উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিয়াছে। চাষা মহলে দুঃখের আর অবধি নাই। গৃহ-সামগ্রী যার যাহা ছিল, এই দুর্ভিক্ষে সমস্তই গিয়াছে। স্বরূপের সম্বলের মধ্যে ছিল এক যোড়া বলদ। যখন প্রাণের দায়ে নাম মাত্র মূল্যে তাহার এই অমূল্য সম্পত্তিটী বিক্রয় করিতে হইল, তখন সত্য সত্যই সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। তবে শুনা যাইতে লাগিল বৎসরটা কোনও ক্রমে কাটিয়া গেলে, সামনের বৎসরে নাকি মানুষের খুবই সুখ সুবিধা হইবে। অন্ততঃ পাড়ার বৃদ্ধ আচার্য্য ঠাকুর এইরূপই বলেন। স্বরূপ এই আশ্বাস বাক্যেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু হইলেই বা উপায় কি? চাষার প্রধান সম্পত্তিই হাল ও গরু। গরু নাই, হাল খানাও কবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সকালবেলা স্বরূপ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ অবধি কি চিন্তা করিল। পরে গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িতেই স্ত্রী সৌরভী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চল্‌লে আবার এত বেলায়?"

"এই এক্ষুণি আস্‌চি।" বলিয়াই স্বরূপ চলিয়া গেল।

বাড়ী হইতে কিছুদূরে হেমন্ত বেওয়ার বাড়ী। তার পুঁজির মধ্যে দুইটী নাবালক ছেলে, কিছু জমি-জমা, আর এক যোড়া বলদ। স্বরূপ গিয়া এই হেমন্তর সহিত পরামর্শ করিতে বসিল। কহিল, "বউ! তুমি তোমার বলদ যোড়া দাও, আর আমি গায়ের মেহনৎ আর লাঙ্গলের খাটুনি দিই, বখ্‌রায় কায করি; তোমারও জমিজমা চাষ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও যাবে। একথায় কি বল বউ?"

হেমন্ত এ প্রস্তাবে উত্তর করিল, "তা বেশ ত! কিন্তু নাঙলের কি হবে? আমার নিজের ত নেই, তোমার আছে কি?"

স্বরূপ মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কহিল, "নাঙলের জন্যেই ত মুস্কিল! হালের সকল গুলো সরঞ্জাম জুৎ জাত মতন করতে গেলে নিদেনপক্ষে সেও ৪।৫ টাকার দরকার।"

হেমন্ত কহিল, "আমার নিজের কোনো উপায় থাকলে কথাই ছিল না। কোনো রকমে তোমার মনিবের হাতে পায়ে ধরে যদি অন্ততঃ গোটা দশেক টাকাও নিতে পার ত, অনেকটা উপায় হয়। শীগ্‌গির করে ঠাকুরপো! এর পরে কিন্তু গাঁয়ের ছুতোরেরা সব বিদেশে বেরিয়ে পড়বে।"

স্বরূপ কহিল, "একথা মন্দ বলনি বউ। যাই ত দেখি একবার মনিবের কাছে।" বলিয়াই সে আর দ্বিরুক্তি মাত্র করিল না, সেই পায়েই মনিব বাড়ী রওনা হইল।

মনিব জাতিতে ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত বলিয়াও পাড়াগাঁয়ে তাঁর একটা খ্যাতি আছে, কিন্তু আচরণে কসাইয়েরও অধম। স্বরূপকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কিরে স্বোরপো যে! কি মনে করে?"

স্বরূপ যতটা উৎসাহ লইয়া মনিব বাড়ী আসিয়াছিল, মনিবের চেহারা

দেখিয়া ও প্রশ্ন শুনিয়া তার যে উৎসাহ অনেকটা জল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটীতে কি ছাই ভস্ম আঁচড় পাড়িল। পরে হেমন্তর শেখানো কথাগুলি কোন রকমে বলিয়া ফেলিয়া, যেন একটা আসন্ন বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

যাজনিক ব্যবসা ও তেজারতী কারবারেই রামগোপালের যত কিছু সাংসারিক উন্নতি। স্বরূপকে দেখিয়াই তার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন প্রকৃত ব্যাপারটা শুনিয়া অলক্ষ্যে একটুখানি হাসিয়া মুখে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এমন অসময়ে কি হাতে টাকা থাকে রে স্বরূপ? যা কিছু ছিল, একেবারে ঝুলি ছাড়া করে কোনও মতে জমীদারের নিলামটা রদ করেছি। তোরা ত আমার ভিতরকার খবর কিছুই জানিস্‌নে! বাইরে থেকে মনে করিস্ পণ্ডিত মশায়ের অত টাকা, তত টাকা।"

স্বরূপ ভাবিল, পায়ে ধরিয়া কান্নাকাটী করিলে মনিবের হৃদয় যতই কঠিন হোকনা, তাহাতে একটুখানি দয়ার সঞ্চার হইবেই। হাজার হোক্, ব্রাহ্মণ ত! এই ভাবিয়া স্বরূপ একেবারে মনিবের পায়ের সাম্‌নে উপুড় হইয়া পড়িল। ঠাকুর মহাশয় সংযত কণ্ঠে কহিলেন, "ছ্যাখ্! তোকে টাকা দিতে হলে আমাকে আবার জগা পোদ্দারের কাছে টাকা ধার করতে হবে। তো-বেটাদের জ্বালায় ত আর ঘরে টিকে থাকবারও উপায় নেই! তোর জন্যে আমাকে আবার গিয়ে সেই চামারের হদ্দ শুঁড়ী বেটার কাছে হাত পাততে হবে!"

মনিব মশাইয়ের এই আশ্বাস বাক্যে এবং শেষোক্ত মন্তব্যে স্বরূপ একটু ভরসা পাইল। কহিল "তা কি করবেন দেবতা! বাঁচিয়ে রেখেছেন ত আপনিই। সময় হোক্, অসময় হোক্, দায়ে ঠেকলেই দৌড়ে আসি আপনারই কাছে।"

"তাতো আসিস্! আর আমিই কখনো তোদের নিরাশ করে থাকি, বলতে পারিস?" বলিয়াই গর্ব্বের ভরে স্বরূপের মুখের পানে তাকাইলেন।

স্বরূপ অমনি জিভে কামড় খাইয়া বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! এমন কথাও কখনো হতে পারে যে আপনি উপকার করেন না? এখনো যে আকাশে চন্দর সূর্য্যি উঠছেন, দেবতা! এখনও যে দিন-রাত চল্ছে!"

"সে কথা ত হল রে স্বরূপ! টাকায় দু আনা সুদ না দিলেও ত জগা বেটা ছাড়বে বলে মনে হয় না। দেখি ত, কি করে উঠতে পারি। কিন্তু সাবধান। কাকেও বলিসনে যেন যে আমি শুঁড়ীর দোরে গেছি টাকা ধার করতে!" বলিয়া স্বরূপকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা স্বরূপের পুনরাগমনের সাড়া পাইয়াই পণ্ডিত মশায় একটুখানি বাড়ীর ভিতর গা-ঢাকা দিলেন। পরে ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিয়া যেন কিছুই জানেন না, এম্নি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে! কখন এলি? আমিও এই ধুলো পায়ে সেই শুঁড়ী বেটার বাড়ী থেকে ফিরচি! রাম রাম! এমন অপকর্ম্মটাও করালি আমাকে দিয়ে স্বোরপে!—যাক্, তোর কাযটা ত হল, সেই আমার লাভ!" বলিয়াই আটটী টাকা কোমর হইতে খুলিয়া তাহার হাতের মধ্যে দিয়া বলিলেন, "নে, এখন টাকা ত পেলি?"

স্বরূপ উত্তর করিল "আজ্ঞে হাঁ তা পেয়েছি বই কি।"

"আচ্ছা একটুখানি সবুর কর দেখি"—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ একখানা লেখা কাগজ, আর একটা কালির ন্যাতা আনিয়া তাহার সাম্নে ধরিয়া বলিলেন, "দেখি তোর বাঁ-হাতখানা একবার।"

স্বরূপ কলের পুতুলের মতন হাত বাড়াইয়া দিল। পণ্ডিত মশায় তখন সেই কালির ন্যাতার উপর তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী লইয়া যেন

রীতিমত মল্ল যুদ্ধ করিতে লাগিয়া গেলেন। বেচারার আঙ্গুলটীকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া টিপিয়া টিপিয়া অবশেষে কাগজে টিপ মারা সমাধা হইল। "বেটার যে হাত, যেন হাতুড়ী পিটেও নোয়ানো যায় না। সুদ কিন্তু মাসে টাকায় দু আনা মনে রাখিস্!—শীগ্‌গির টাকা দিয়ে ফেলবার চেষ্টা করিস্, নইলে মারা যাবি শেষটায় তাও বলে দিচ্ছি।" স্বরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত আবার পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে বিদায় হইল।

পরদিনই সে ছুতার ডাকিয়া হালের সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত করিয়া লইল।

২

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া গেল। যে আশায় বুক বাঁধিয়া স্বরূপ চাষ সুরু করিয়াছিল, সে আশা পণ্ড হইয়া গেল। অসময়ে বন্যার জল আসিয়া অনেকেরই শুধু পাকা ধান ডুবাইয়া ছাড়িল না, পাটেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিল। অনেকেরই ঘরে হাহাকার উঠিল।

এই জন্য এবার পাটের দরও খুব চড়া। পণ্ডিত মশায় এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। এখন প্রত্যহই স্বরূপকে এমনভাবে টাকার তাগাদা করিতে লাগিলেন, যে একদিন সে তাড়ার চোটে অস্থির হইয়া বলিতে বাধ্য হইল, "কি কোরবো দেবতা? আছে মন দুয়েক পাট ঘরে. তাই বিক্রী করে আপনারও সুদের গণ্ডা কিছু দেবো, নিজেদেরও দু চারটে দিন পেটের খোরাক কোনও মতে চালিয়ে নেবো।" পাটের উল্লেখ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ! ঘরে পাট থাক্‌তে আমাকে মিছে ভোগাচ্ছিস্? দেখি দেখি ক'মণ আছে?" বলিতেই ঘরের

দাওয়ার একপাশে একটু বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট পাটের গাদিটা যেখানে ছিল, হঠাৎ তাহার উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হইল। ব্রাহ্মণ দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িলেন। গাদিটার কাছে গিয়া নিজে মনে মনে পরিমাণের একটা অনুমান করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে স্বোরপো! ঠিক ক'মণ হবে, বল দেখি সত্যি করে?"

স্বরূপ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "আজ্ঞে তা প্রায় ৩।৪ মণ হবে খনি।"

"তবে না বলেছিলি দু'মণ?" স্বরূপ অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল।

"এই ত বেটা হাতে দই পাতে দই, তবু বলছিস্ কই কই? এতটা জিনিস ঘরে থাক্‌তে বেমালুম মহাজনকে ফাঁকি!—ও সব চালাকি আর খাটছে না! দু'মণ নিজ মুখে বলেছিস্, ঐ দু'মণই সই। আর এতে জল আছে ক'মণ? যাক্ সুদের দশ মাসের ১০৲ টাকা এতেই উশুল হয়ে যাবে এখন।" বলিয়াই নিজের হাতে পাটের গোছাগুলি এক একটী করিয়া উঠানে আনিয়া জমা করিতে লাগিলেন।

স্বরূপ নিতান্ত অসহায়ের মত ছলছল নেত্রে মনিবের পানে তাকাইয়া তাঁহার এই দস্যুবৃত্তি দেখিতে লাগিল। কিন্তু সে মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার কথাটী কহিবার সাহস পর্য্যন্ত হইল না। অবশেষে তিনি যখন ধুমধাম সহকারে লুণ্ঠন সমাধা করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তখন সে একবার পণ্ডিত মশায়ের পা দুখানা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু বিজয়োল্লাস দৃপ্ত পণ্ডিত মশাই তাহাকে সজোরে এমন ভাবে ধাক্কা মারিয়া চলিয়া গেলেন, যে বেচারী আপনাকে সামাল দিতে না পারিয়া সেইখানেই মাটীতে পড়িয়া গেল। রোষে, ক্ষোভে, ধিক্কারে তাহার বুকের ভিতর একটা প্রবল উষ্ণ রক্ত-স্রোত বহিয়া গেল। চোখ দু'টী দিয়া যেন জ্বলন্ত

অনল কণা ঠিক্‌রিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা আপনিই হস্তদ্বয়ও একটীবার মুষ্টিবদ্ধ হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বদ্ধ মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। নিতান্তই অসহায় অপরাধীর মত বিবশ-বিকল-দেহে সেখানে বসিয়া বসিয়া বেচারা কেবল ভাবী অদৃষ্ট পরীক্ষারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর পণ্ডিত মশায় কাসিতে কাসিতে আবার আসিয়া সশরীরে উপস্থিত। নিতান্ত ভাল মানুষের মতন স্বরূপের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই নে, মাসে এক টাকা হিসাবে দশ মাসে দশ টাকা সুদ হয়েছিল, তারি রসিদ। আমি বাপু কস্মিন কালেও ছল চাতুরীর ধার দিয়েও যাইনে! যে টাকা দিয়েছিস্, তার রসিদ পেলি ত? ব্যস্!—"

স্বরূপ একটুখানি মাথা তুলিয়া পণ্ডিত মশায়ের মুখের পানে তাকাইল। তার পর দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি মুখ্যু চাষা, আমার কাগজ-পত্তরের দরকার কি? ও আপনি নিয়ে যান। আপনার ঠেঁয়েই রেখে দিন গে।"

"তা যদি আমাকে বিশ্বাসই করিস্, আমার কাছেই থাকুক।" বলিয়াই হাসিতে হাসিতে কাগজখানা কোমরে গুঁজিয়া পণ্ডিত মশায় বাড়ী রওনা হইলেন।



পরদিন স্বরূপকে আর এ গ্রামে দেখা গেল না। তার বাড়ীতে দুইখানি মাত্র খড়ের ঘর। দেখা গেল দুইখানি ঘরেই দরজা বাঁধা। কোথায় যে গিয়াছে, কেহই বলিতে পারিল না। অচিরেই এই দুঃসংবাদ বিদ্যারত্ন মশায়ের শ্রুতিগোচর হইল। আহ্নিকে বসিয়া ছিলেন, টান মারিয়া কোশাকোশী ফেলিয়া দিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। তারপর

এক দৌড়ে মুক্ত কচ্ছাবস্থায়, স্বরূপের সাত পুরুষের জল-পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতে করিতে, তার বাড়ীর উপর গিয়া উপস্থিত হইলেন। টাকা শোধ না দিয়া, খাতক পলাতক। "হারামজাদা পাজি নচ্ছার নরকে যাবেন, তারই ব্যবস্থা হচ্ছে!" বলিতে বলিতে তাহার জনশূন্য বাড়ী-ঘরের দিকে তাকাইয়া তিনি একরূপ কাঁদিয়াই ফেলিলেন। পরে হেমন্তর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিতে লাগিলেন, "স্বোয়ূপোটার এত বড় সাহস কখনো হ'ত না! তাকে কুযুক্তি দিয়ে নষ্ট করেছে ঐ হারামজাদী নষ্টা মাগী।" বলিতে বলিতে মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তেই পিছন হইতে হারামজাদী মাগীর গলার কাঁসার আওয়াজ খন খন করিয়া বাজিয়া উঠিল। "কি বল্‌লে ঠাকুর মশাই? মানের ভয় থাকে ত মুখ সামলে করে কথা বোলো!—মুখে দাও তুমি জগা পোদ্দারের দোহাই, কাজের বেলায় নিজেই যে তুমি জগাপোদ্দারেরও অধম সে কথা কি মিথ্যে? গরীব বেচারার পাঁচমণ পাটের দাম কি এই চড়া বাজারে দশটাকা? আমরা পাট বিক্রী করিনি এবার? কম সম ৫ টাকা করে মণ হলেও ২৫টে টাকা হয়। তা থেকে তোমার পাওনা গণ্ডা হিসেব করে নিয়ে বাকীটে তাকে ফিরিয়ে দিলে ত আর বেচারী অমন করে ভিটে ছাড়া হয়ে যেত না!"

ঠাকুর মশাই হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন 'চুপ কর হারামজাদী বেটী!"

"কেন, তোমার ভয়ে? উচিত কথায়—বামুনের বড্ড গায় লেগেছে না?" বলিতে বলিতে হেমন্ত যেমনি বেগে হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি বেগেই ঘরমুখো চলিয়া গেল।

পণ্ডিত ম'শায়ও নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে হেমন্তর শিশু পুত্রসহ শ্বশুরকুলের সদ্‌গতির ব্যবস্থা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৪

পাশের গ্রামেই স্বরূপের শ্বশুর বাড়ী। কিন্তু শ্বশুর জামাতায় সদ্ভাব ছিল না বলিলেই হয়। যতদূর জানা যায়, স্বরূপের পিতা, পুত্রের বিবাহে এক শত টাকা পণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দিয়াছিল মাত্র ৭৫৲। অবশিষ্ট ২৫৲ টাকার জন্য বেয়াইয়ে বেয়াইয়ে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল। ঋণকর্ত্তা ত ঋণ দায় হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই জীবন-মুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু কলহ মিটিল না। ইহাব জের গিয়া পৌঁছিল জামাতায়। শ্বশুর রামধন অতি দুর্ম্মুখ লোক। সাক্ষাতে অসাক্ষাতে যখন তখন স্বরূপের পিতার নিন্দা না করিয়া ছাড়িত না। এই উপলক্ষে কন্যা সৌরভীকেও সে খোঁটা দিতে কসুর করিত না। সে হয়ত কখন কখন পিতার উপর বিরক্ত হইয়া বলিয়া বসিত "তাঁর ত ছেলেই রয়েছে টাকাটা আদায় করলেই হয়।" সে কথায় বৃদ্ধ হয় ত এমন একটা উক্তি করিয়া ফেলিত, যাহা কোনো অবস্থাতে ঐ সম্পর্কীয় লোকের সম্বন্ধে বলা চলে না। স্ত্রীলোক স্বামীর নিন্দা কোনো কালেই সহ্য করিতে পারে না। তাই সৌরভী পিত্রালয়ের নামও কখনো মুখে আনিত না। কিন্তু উপায় কি? সেদিন যখন গভীর রাত্রে মনিবের উৎপীড়নের কথা আলোচনা করিতে করিতে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়াই স্বামী-স্ত্রীতে গৃহত্যাগের সংকল্প করিয়াছিল, সেদিন কোথায় যে যাইবে এমন কথা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ক্ষিপ্রহস্তে নিজেদের যা কিছু জিনিস পত্র ছিল, বাঁধা-ছাদা করিয়া উভয়েই ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

পথে বাহির হইয়া স্বরূপ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাওয়া যাবে?" সৌরভী উত্তর দিল, "যে দিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে।"

স্বরূপ কহিল, "সে হত যদি আমি একা হতাম। সঙ্গে যে তুমি রয়েছ। চল তোমার বাপের বাড়ীই যাওয়া যাক্!"

বাপের বাড়ীর কথা শুনিয়াই সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ একবার শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "আবার সেখানে?...আর সেখানে ছাড়া যাবই বা কোথায়! চল সেখানেই!" বলিয়াই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।



গৃহ-জামাতার সুখ বোধ হয় স্বর্গেও নাই!...স্বরূপ এক বৎসর শ্বশুরালয়ের সুখের আস্বাদ কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করিয়া, একদিন রোগশীর্ণদেহে স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পণ্ডিত মহাশয় তখন কোন এক যজমানকে পাতি দিতে বসিয়াছেন। এমন সময় বাহিরের দিক হইতে যেন কাহার কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া দেখেন, তাঁহারই পলাতক খাতক স্বরূপ। স্বরূপকে দেখিয়াই বলিয়া ফেলিলেন "তাইত বলি, ছোট লোকের ছেলে হ'লে কি হবে? স্বরূপের আমার যথেষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান আছে। তা, ভাল ছিলি ত? নে, একটু তামাক খেয়ে জিরিয়ে নে?" বলিয়াই একবার গলা বাড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন। দেখিতে পাইলেন একটী স্ত্রীলোক ঘোমটা দেওয়া, নত মুখে দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "ওটী কে রে স্বরূপ? তোর বউ বুঝি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তা ওকে একটুখানি ছায়ায় দাঁড়াতে বল না। তুইও ত আচ্ছা

মানুষ যা হোক!" বলিয়াই তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা দিতে এসেছিস ত?"

স্বরূপ চুপ করিয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন সে টাকা দিতেই আসিয়াছে। অমনি আনন্দে গদ গদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "টাকা দিবি ত, বের কর্‌তে দেরী কচ্ছিস কেন রে বাপু? টাকাটা দিয়েই ফ্যাল্ না আগে, তারপর তামাক খেয়ে জিরিয়ে ধীরে সুস্থে বাড়ী যাস্ এখন।"

স্বরূপের মুখ হইতে একটী মাত্র কথাও বাহির হইল না। হেঁট মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া কেবল মাটীতে আঁচড় কাটিতে লাগিল। তাহার এই অযথা বিলম্ব দেখিয়া, পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "দ্যাখ্ আর ন্যাকামো ভাল লাগে নারে স্বোর্‌পো! এনেছিস্ই যখন, তখন দিয়ে ফেলে তোর কাগজ খানা খালাস ক'রে নিয়ে চ'লে যা না কেন? ল্যাটা চুকে যাক্। দেনাও মানুষে এমন করে কখনো পুষে রাখে! মুখ্যু কিনা, তাই সৎপরামর্শে গ্রাহ্যিই নেই!"

স্বরূপ একটীবার বেড়ার আড়ালে গিয়া স্ত্রীর সহিত কি পরামর্শ করিল। তারপর যখন ফিরিল, তখন তার কাঁধে লাঙ্গল, হাতে একটা পোঁটলা। পণ্ডিত মহাশয় ক্ষণকাল অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এসব আবার কিরে স্বোরপো!"

স্বরূপ কোমর হইতে একছড়া রূপার গোট ও দুই গাছি পৈঁচা বাহির করিয়া মনিবের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দিয়া বলিল, "দেবতা! এই নিয়ে আমাকে খালাস দেন।"

ঠাকুর মহাশয় চোখের চশমাখানা দুই তিন বার কোঁচার খুঁটে মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া নাকের উপর বসাইলেন। পরে ঘাড়টাকে এদিক্ ওদিক্ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া গহনা কয়খানাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই বুঝি তোর রূপো রে হারামজাদা! আমরা যেন কোনও দিন রূপোও

দেখিনি আর সীসে রাঙ্গও দেখিনি! পাজি নচ্ছার জোচ্চোর! সেই কত করে' কেড়ে পাট ক গাছি এনেছিলাম,—তাও জলে ভেজা। যা হোক্, কতকটা সুদ তাতে উঠেছিল। তার পর প্রায় দেড়টা বৎসর হ'তে চল্‌ল; একটী কাণা কড়িও দেবার নামটী নেই! শেষে আর কি করি? তোর নামে নালিশ করে ৩০৲ টাকার এক ডিক্রী করে রেখেছি। এই টাকা যদি নগদ হাতের ওপর দিতে পারিস, ত তোর দলিল ফিরিয়ে পাবি। কথা বলিস্‌নে যে?"

নালিশের কথা শুনিয়াই স্বরূপের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রাগের ভরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, "নালিশ করলেই হ'ল ম'শাই? রাজার আদালতে কি ন্যায়-অন্যায় নেই? হাকিম আমলারা কি সকলেই আপনার মতন?"

ঠাকুর হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কথা বল্‌লে ত আর দায় কাট্‌ছে না! টাকা দিবি কিনা বল্! নইলে মিছেমিছে সোমত্ত মাগ সঙ্গে করে এসে ন্যাকাপানা করলে ত আর মহাজনের দেনা শোধ হয় না।"

স্বরূপ এতক্ষণ সাবধান হইয়াই কথা কহিতেছিল। এবারে এই অশ্রাব্য উক্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "সাবধান ঠাকুর! একে ব্রাহ্মণ, তায় মনিব—নইলে স্বরূপ মণ্ডল ম'রেও এখনো মরে নি।"

স্বরূপের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় দুই পা পিছনে হটিয়া আসিয়া, হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি রে মারবি নাকি?"

স্বরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিল, "স্বরূপ, চাষীর ছেলে হলেও, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা জানে। তবে এটাও মনে রাখবেন ঠাকুর মশাই, আজকে আপনি আমাকে বাড়ীর ওপর পেয়ে যাই কেন বলে যান না, আপনার এমন শক্তি এখনও নাই যে ইচ্ছা মত যা খুসী করতে পারেন! এই আমি চল্‌লাম। বেঁচে থাকতে, আপনার এ ব্যবহার

কখনো ভুলব না ঠাকুর মশাই! একদিন বাড়ীর ওপরে থেকে জুলুম করে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছিলেন, আজ আপনার বাড়ীর ওপর থেকেই আমার পুঁজি পাটা নিয়ে চলে যাচ্ছি। পারেন, আমাকে আটক করুন।" বলিয়াই লাঙ্গল খানাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইল। পরে গহনা দুখানাকে কোমরে গুঁজিয়া পোঁটলাটা হাতে তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে কহিল—"দেনা শোধ ত হ'ল, এখন চল যাই, যে দিকে দু চোখ যায়!" স্বরূপ যে মূর্ত্তিতে স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া মনিবের বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া কোনও কথা কহিতে পণ্ডিত মহাশয়ের সাহসে কুলাইল না।

৬

যখন সত্য সত্যই স্বরূপ চলিয়া গেল, মুখ হইতে শিকার ছুটিয়া পলায়ন করিলে ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র পশুর অবস্থা যেরূপ হয়, পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইল। কি করিবেন, সহসা স্থির করিতে না পারিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কিয়ৎকাল সেখানে পাদচারণা করিলেন। পরে সেখান হইতে গিয়া যজমানকে অল্পখরচায় একটা পাতি দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বেলা তখন নিতান্ত কম হয় নাই। তিনি স্নানাহ্নিকের কথাটা একবার চিন্তাও করিলেন না। অনলবর্ষী রৌদ্রের মধ্যে গামছা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। নিজেদের পাড়া নমঃশূদ্র পাড়া ছাড়াইয়া, সোজা মেঠো পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। যাহাকে সম্মুখে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "ওগো এ পথ দিয়ে একটী পুরুষ আর একটী স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছ?" সকলেই আপন আপন কাযে ব্যস্ত,—কে আর উত্তর দিবে! অগত্যা ঘণ্টা দুই তিন রৌদ্রের মধ্যে পথে পথে ঘোরাঘুরি করিয়া শ্রান্ত

ক্লান্ত অবস্থায় ঘর্ম্মাক্ত দেহে যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইয়াছে। মুহূর্ত্ত মাত্রও বিশ্রাম না করিয়া সেই ঘর্ম্মাক্ত দেহেই স্নান করিতে গেলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। প্রথমতঃ একটু-খানি শীত শীত করিতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তে স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

সেই অবস্থায়ই আহ্নিক সমাপন করিয়া আহারে বসিলেন। আহার নামমাত্র। বিশেষতঃ আজিকার ঘটনাটী কেবলই থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। স্বার্থের জন্য ক্রোধের ভরে বেচারীর প্রতি যতই রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারও ত দেহে মানুষেরই প্রাণ! সেই রোগশীর্ণ লোকটীর ক্লিন্ন মুখের পানে তাকাইয়া তাঁহার প্রাণে এতটুকু দয়ারও উদ্রেক হয় নাই; কিন্তু এখন আহারে বসিয়া ক্রমাগত সেই মুখখানাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যে হস্ত আর্ত্ত নিঃসম্বল দয়ার ভিখারীকে এতটুকু অনুগ্রহ হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে, সে হস্তে কিছুতেই অন্নের গ্রাস তাঁহার মুখে উঠিল না। অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী দাক্ষায়ণী কহিলেন, "জ্বরে দেখি কাঁপ্‌চ! এ অবস্থায় খেতে না বস্‌লেই ত হত!" রামগোপাল সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিজের মনে মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এই দুপুর বেলায়, বেচারী রোগা শরীরে বউটাকে সঙ্গে করে আমার বাড়ীর উপর থেকে জলরত্তি মুখে না দিয়ে চলে গেছে। টাকার জন্যে তাকে কত না নির্য্যাতন করেছি! দুর্ব্বল শীর্ণ শরীর দেখেও তার উপরে আমার এতটুকু মমতা হয়নি!...এমন অসময়ে মানুষের বাড়ী থেকে বেড়াল কুকুরটা পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যায় না। আর সে বেচারী ত মানুষ! আমার জায়গায় তাদের তিন পুরুষ কেটে গেছে! কোন্ মুখে ভাতের গ্রাস তুলবো বল ত?" বলিতে বলিতে গণ্ডুষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

দাক্ষায়ণী উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "জ্বর হয়েছে শুয়ে থাকগে। বকলে মাথা আরও গরম হবে।" রামগোপাল সে কথায় কোন উত্তর না করিয়া জ্বর বিকম্পিত কণ্ঠে গান করিতে করিতে শয়ন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অর্থ অর্থ করে রে মন অর্থ যে কি তা চিন্‌লিনে।
নাইরে অর্থ ভবে অন্য চিন্তামণির চরণ বিনে ॥
অর্থ তোর ওই তুচ্ছ টাকা, হয় যাতে রে বুদ্ধি বাঁকা,
চিত্ত রয় অজ্ঞানে ঢাকা মোহের ঘোরে রাত্রি দিনে।
জ্ঞানের বাতি 'জ্বলে এবার, দূর করেদে মোহের আঁধার,
তোর আপন ঘরে কি আছেরে খুঁজে তারে দেখ্‌না কেনে!
অর্থ ত অনর্থ কেবল পদে পদে বাড়ায় কুফল
পাপের পথটি বড়ই পিছল সেই পথেতে নেযায় টেনে॥
হৃদয়টি তোর সোণা খাঁটি হেলায় তারে কর্‌লি মাটী
প্রেম নিকষে দ্যাখ্‌না কষে এমন নিধি আর পাবিনে।
থাক্‌তে ঘরে অমূল্য ধন বাইরে মিছে খুঁজিস্‌ রতন,
এই রতনের মূল্য দিয়ে সেই পরমার্থে নেনা কিনে॥

শয্যায় শয়ন করিয়াও জ্বরের ঘোরে আপন মনে গায়িয়া যাইতে লাগিলেন—'নাইরে অর্থ ভবে অন্য চিন্তামণির চরণ বিনে।' স্বামীর মুখে জ্বরের ঘোরে হঠাৎ এই পারমার্থিক সঙ্গীত শুনিয়া স্ত্রী দাক্ষায়ণীর বুকটা কেবলি থাকিয়া থাকিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কাছে গিয়া মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, উত্তাপ এত বেশী যে হাত রাখা যায় না। ব্যস্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এমন জ্বর কি জন্যে হল বল দেখি?"

পণ্ডিত মহাশয় একটুখানি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বুঝি পারে যাবার তলব এসেছে।"

"বালাই! অমন অলক্ষুণে কথা বল্‌তে নেই! যাই দেখি অক্ষয় আচার্য্যিক ডেকে নিয়ে আসি।"—বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইবেন, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিলেন, "তার চেয়ে বরং একটা কাষ কর।"

দাক্ষায়ণী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অক্ষয় কবিরাজকে ডাকাইলেন অক্ষয় আসিয়া নাড়ী টিপিয়াই, সান্নিপাতের যতগুলি লক্ষণ থাকিতে পারে, সবগুলিই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পরে গৃহিণীর নিকট হইতে গোপনে ৫টী টাকা করায়ত্ত করিয়া, চাদরের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে, দুই একবার চোখ রগড়াইয়া সান্ত্বনাসূচক বাক্যে বলিয়া গেলেন, "ভয় কি? বাবা বৈদ্যনাথ আছেন খুড়ী ঠাকরুণ! ও বেলায়ই আমি মহালক্ষ্মী বিলাসটা দিয়ে যাব। খুব সাবধান! ওঁকে আর জানাবেন না। দরকার হয়ত পুঁটিকে নিয়ে এ'লেই হ'ল।"

পুঁটি ইহাঁদের একমাত্র সন্তান। বিদেশে স্বামীর বাসায় থাকে। তাহার পিত্রালয়ে আসা বড় ঘটিয়া উঠে না। দাক্ষায়ণী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "কি জানি বাবা কি আছে অদৃষ্টে! পুঁটিই কি আমার দেশে থাকে, যে ইচ্ছা করলেই অমনি নিয়ে এলাম!" বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অক্ষয় সেদিন কি ভাবিয়া যে বলিয়াছিল 'দরকার হয়ত পুঁটীকে আনাবেন, এ কথাটা সেদিন দাক্ষায়ণী অতটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু সপ্তাহ কাটিয়া গেলেও যখন দেখা গেল যে অক্ষয়ের ঔষধে রোগীর আরোগ্য লাভ ত দূরের কথা, উত্তরোত্তর তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গের অভিমুখেই অগ্রসর করিতেছে, তখন তিনি কবিরাজের এই

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীর কাছে পুঁটিকে আনার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাইলেন, "পুঁটি এসে কি আমার স্বর্গের সিঁড়ি গেঁথে দেবে?" কথাটা শুনিয়াই ভয়ে চুপ করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সেইদিন গোপনে অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ অক্ষয়! ওষুধে ত কিছুই হচ্ছে না।" অক্ষয় একটা ঢোক গিলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "সে জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না খুড়ী ঠাকরুণ। মানুষ মাত্রেরই দেহে কিছু পাপ আছে কি না, সেটা না খণ্ডে গেলে স্বয়ং ধন্বন্তরীরও সাধ্য নেই যে পীড়া আরোগ্য করেন। তবে খুড়ো ঠাকুরের জন্যে কিছু ভাবনা নেই। এমন মানুষেরও দেহে কি কখনো পাপ থাকতে পারে? তবুও জানেন কি, সংসারে বাস করতে গেলেই একেবারে নিষ্পাপ থাকা যায় না। কোন্ সূত্রে কখন পুণ্যাত্মাদের দেহেও একটু আধটুক পাপ এসে প্রবেশ করে। যাক্ সেজন্যে কোনই ভয় নেই। সত্বরই উনি রোগমুক্ত হয়ে উঠবেন।" বলিয়া অক্ষয় মনে মনে মা দুর্গার নাম জপ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

দাক্ষায়ণী কিন্তু কবিরাজের এই আশ্বাস বাক্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। ডাক্তার আনার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু রোগী বাধা দিয়া কহিলেন, "আর ডাক্তার কেন? অক্ষয় ত আছে। ছাখ, আমাকে আর মিছা-মিছি জোর করে কতকগুলো ওষুধ গিলিয়ো না। বরং এক কায কর। যদি কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে স্বরূপটার খোঁজ করতে পারত, তার চেষ্টা ছাখ। আর একটা কথা বলে যাচ্ছি, রাখ্‌বে ত? তার সঙ্গে আমার দেখা এ জীবনে আর হবে না। কিন্তু যদিই সে ফিরে আসে ত, তাকে আমার হয়ে যা খুসী দিও, তাতে কিছুই অন্যায় হবে না।"

দাক্ষায়ণী নীরবে মাথা হেঁট করিয়া সম্মতি জানাইলেন। পরদিনই

তিনি জনৈক প্রতিবেশীকে কিছু টাকার লোভ দেখাইয়া স্বরূপের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। ধারণা, স্বামী আরোগ্য লাভ করিবেন। লোকটা ৪।৫ দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, 'কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।' কিন্তু ইহার দিন দুই পরে অন্য একজন প্রতিবেশী জেলায় কি একটা মামলা উপলক্ষে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই! যার জন্যে এত খোঁজাখুঁজী, সে ত হাজতে। যদ্দূর বুঝ্‌তে পারলাম, পেটের দায়ে চুরি কি ডাকাতি একটা কিছু অপকর্ম্ম করতে গিয়ে মানুষ জখম করে বসেছে। তাই ধর পাকড়, হাজত। জেল ত জেল্—যে কড়া হাকিম, নিদেন পক্ষে দু'টি বছর না ঠুকে ছাড়বে না।"

জেলের কথা শুনিয়াই রামগোপালের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি কেবলি কহিতে লাগিলেন, "ওগো পার ত, তোমরা কেউ তাকে অন্ততঃ একটিবার আমার কাছে নিয়ে এস। আমার যা বলবার আছে, তাকে বলে-কয়ে বিদায় হয়ে যাই। আমার ভিতরে ভিতরে দাউ দাউ করে' কেবল নরকের আগুন জ্বলছে, তার একটুও বিরাম নেই। জ্বলে পুড়ে মলাম গো, জ্বলে পুড়ে মলাম। আমাকে কেউ এ আগুন থেকে রক্ষা করতে পার না? বাপ্‌রে, মহাজনী! টাকায় দু আনা সুদ, তাতেও উসুল ছাঁট! ভ্যালা বিপদ। ওই যে সব আস্‌ছে টাকার জন্যে এখন উপায়? টাকা নেই টাকা নেই। সব ফুঁকে দিয়েছি, সব ফুঁকে দিয়েছি। হাঃ হাঃ হাঃ, রোসো সব, নরকে গিয়ে টাকার গাদির ওপরে গুলজার হয়ে বসে, মহাজনী কোরবো, আর তোমাদের দিকে চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌বো টাকায় দু আনা করে সুদ নিয়েছি, এবার নেবো টাকার টাকা সুদ, বুঝেছ ত সব?" এই রকম কত কি প্রলাপ বকিতে বকিতে রাত্রি শেষ হয়। দিন আসে, দিনের বেলায় কতকটা ভাল দেখা যায়। তখন বলিতে থাকেন, "এ জেল তাকে আমিই দিইয়েছি। তোমরা

আমাকে যদি আরাম করে তুল্‌তে পার ত আমি আদালতে হাজির হ'য়ে হাকিমকে বলবো, 'ধর্ম্মাবতার! যে শাস্তি হয়, তা আমাকে দিন্। এ বেচারী নিরপরাধ।' —তা কি আর সম্ভব? সত্যিই যে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। দেখ, যদিই কখনো তার দেখা পাও ত আমার হয়ে তাকে তোমরা কেউ বোলো যে, তার ঋণ থেকে আমি অনেক আগেই তাকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু সে যে ঋণজালে আমাকে জড়িয়ে রেখে গেছে, তা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে একমাত্র সেই পারবে।"

দাক্ষায়ণী স্বরূপের মামলার তদ্বিরের জন্য গোপনে টাকা-কড়ি দিয়ে যে ব্যক্তিকে জেলায় পাঠাইয়াছিলেন, সে আসিয়া জানাইল যে স্বরূপের এক বৎসরের জেল হইয়াছে। রামগোপালের তাৎকালীন অবস্থা দেখিয়া এ সংবাদটা তাঁহার কাছে গোপন রাখিবার চেষ্টা স্বত্বেও হইয়া উঠিল না। কেন না হেমন্তও এই সংবাদটার জন্য কম উৎকণ্ঠিত ছিল না। সংবাদটা তাহার কর্ণগোচর হইবামাত্রই সে বাড়ীর উপর আসিয়া মুমূর্ষু রাম-গোপালকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিল, "ঠাকুর! এইবার তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। বেচারীকে জেলে পুরে তবে ছেড়েছে।" রাম-গোপাল তখন বারান্দায় শুইয়া। সে ঝড়ের মতন আসিয়াছিল, উঠানে দাঁড়াইয়া ঝড়েরই মতন কথাগুলি বলিয়া চলিয়া গেল। এই সময় পূর্ণ বিকারের ঘোরে রামগোপাল যাহা কিছু কাণে শুনিতেন, মনে করিতেন স্বরূপ কথা কহিতেছে। অমনি শ্লেষ্মা-জড়িত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, "ঐ যে কথা বলে, তবে কি সে এসেছে? এসে থাকে ত, একবারটী কাছে ডাক না!" সমুখে কাহাকেও দেখিলে—বিকারের চক্ষে যে তাহাকেই দেখিতেছেন এমনি মনে করিয়া অমনি বলিতেন, "এলি ত, একা কেন? বউ'বেচারীকে কোথায় রেখে এলি? শোন্! তোকে আর টাকা দিতে হবে না! আমি তোর মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছিলাম, এখন তোকে তার চারগুণ

দিচ্ছি, দশগুণ দিচ্ছি, নিয়ে সুখী হ'য়ে চলে যা। আমিও দেখে খুসী হই।"

হেমন্ত যখন আসিয়াছিল, দেখিতে পাইয়াছিলেন একটা আব্‌ছায়ার মতন কি আসিতেছে। কিন্তু সে যখন কথাগুলি অমন গড় গড় করিয়া বলিয়া চলিয়া গেল, তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জেল! জেল! ওগো তাকে ছাড়িয়ে এনে, আমাকে জেলে দাও! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে জেলে যাব!" বলিতে বলিতে বিকারের ঘোরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া যখন তাঁহাকে শোওয়াইল, তখন তাঁহার দেহে প্রাণ নাই।

৭

এক বৎসর পরে। এমন অন্ধকার আর পৃথিবীর বুকে কোনো দিন ঢলিয়া পড়ে নাই! সন্ধ্যা সবে মাত্র অতীত হইয়াছে। দুইটী পথশ্রান্ত নর-নারী অন্ধকারে ধীরে ধীরে গ্রাম্যপথ ধরিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইল। পুরুষটি জিজ্ঞাসা করিল, "এই যেন মনে হচ্ছে, না?" স্ত্রীলোকটি সে কথায় উত্তর করিল, "হ্যাঁ এই ত সেই বাড়ী! দেখছ না ঠাকুর-ঘর!"

"হ্যাঁ, তাই ত!" বলিয়াই পুরুষটি ঠাকুর-দুয়ারে প্রণাম করিল; স্ত্রীলোকটিও অন্ধকারে গলায় আঁচল জড়াইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাক্ষায়ণী ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেখাইয়া বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে কাহারা

কথা কহিতেছে বুঝিতে পারিলেন না ; তাহাদের কথার ফিস্ ফিস্ শব্দে কেবল তাঁহার জপেই বাধা পড়িল। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে শুনিলেন, "দেবতা কি বাড়ী আছেন নাকি ?"

"অ্যাঁ এ যে স্বরূপের গলার আওয়াজ!" জপের মালা তুলিয়া রাখিয়া ধড়মড় করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। প্রদীপ হাতে করিয়া সামনের দরজায় আসিয়া দেখেন, তাঁহাদেরই স্বরূপ। স্বরূপ মাঠাকরুণের পরনে থান কাপড় দেখিয়া, কাঁদিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠাকুরুণ ; সেই যে আদালতে থাক্‌তে খবর পেয়েছিলাম, সেই খবরই বুঝি শেষ খবর ?"

দাক্ষায়ণী আসন্ন অশ্রু প্রবাহকে জোর করিয়া থামাইয়া ফেলিয়া সহজ গলায় কহিলেন, "হাঁ বাবা, তোমার জেলের খবর শুনেই ত সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

স্বরূপ আর কথা কহিতে পারিল না। মাথায় হাত দিয়া সেইখানে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

দাক্ষায়ণী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "সে জন্যে আর আক্ষেপ করে কি হবে ? তাঁর মৃত্যু ঐ রকমই লেখা ছিল, সে জন্যে ত আর তুমি দায়ী নও বাবা! এসেছ ত বউকে নিয়ে ভেতরে এস।"

স্বরূপ বলিতে লাগিল, "মা ঠাকরুণ! মনিব আমার শুনে গেলেন যে আমি চুরি করে', মানুষ জখম করে' জেল খাটছি। কিন্তু ঘটনা তা নয়। পথে বেরিয়েই কাঁধের বোঝাটাকে ফেলে দি'য়ে, টুক্ টাক্ জিনিস খান আর গয়না দু'খান নিয়ে দু'জন পথ চলেছি। বেলা শেষ হয় হয়, এমন সময় এক গাঁয়ের ধারে নদীর পাড়ে বসে ভাবছি রাত কোথায় কাটাই। এমন সময় একজন পাগড়ী পরা লোক এসে আমাকে বলে কি, যে পরের বউ চুরি করে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি! আমি সে কথায় চটে উঠতেই সে আমার একখানা হাত থপ করে' ধরে ফেলে আমাকে বল্‌লে, ১০৲

টাকা যদি দিতে পারিস্ ত তোকে ছেড়ে দিই, নইলে তোকে থানায় নিয়ে যাব। হাতে ছিল লাঠি। ধাঁ করে হাত খানা ছাড়িয়ে নিয়ে মারলাম তার কাঁধে। টাল খেয়ে পড়ে যেতেই কোথায় বা রইল তার আস্ফালন! পালাত কুমড়োর মতন গড়াতে লাগল। তার পর বল্লে বিশ্বেস যাবেন না মাঠাকরুণ! বসালাম আর এক ঘা লাঠি তার মাথায়। বুঝুক্ শালা ভোজপুরী একবার চাঁড়ালের লাঠির চোট্! লাঠি মারতেই ত মাথা ফেটে রক্ত-গঙ্গা বইতে লাগল। লোকজনও কম জড় হ'ল না। কাছেই থানা। আরও পাগড়ীর দল এসে ঝুঁকে পড়ল। এক গুণ মেরে তিন গুণ মার খেতে খেতে থানায় গেলাম। একজন ভদ্রলোক অনেক অনুরোধ করে দারোগা সাহেবকে খুসী করাতে আমার পরিবারকে নিয়ে আর কোনো হাঙ্গাম কল্লে না। তিনিই দয়া করে তার রক্ষা করবার ভার নিলেন। এই ত মাঠাকরুণ ব্যাপার! পুলিশের কল্যাণে আমি হয়ে গেলাম চোর, খুনে!"

দাক্ষায়ণী সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "সে জন্যে দুঃখ করিস্‌নে স্বরূপ! মানুষের কথা ধরিসনে। মনে প্রাণে নিজে যখন খাঁটী আছিস্, তখন আর ভয় কি? সকলের আড়ালে থেকে একজন ত দেখচেন বাবা, কে কেমন। নে, বৌকে আর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখিস্ নে। আমাদের যা কিছু আছে, তার অর্দ্ধেক আজ হ'তে তোর!"

স্বরূপ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মা-ঠাকুরাণীর মুখের পানে তাকাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁরে, যাঁর সম্পত্তি, তিনিই দিয়ে গেছেন।"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সস্ত্রীক স্বরূপ মনিব-ঠাকুরাণীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

সফল সাধনা

১

সে ছিল একজন খুব বড় দরের ওস্তাদ শিল্পী। আপনার মনে নিভৃতে বসে পাথর কেটে মূর্ত্তি বের করত। বিশ্ব জগতের কেউ বড় সে খবর রাখত না।

মস্ত বড় রাজা—হাতীশালে, হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া দিন রাত বাঁধা। ফটকে ফটকে পাহারা শান্ত্রী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিয়ে ফিরছে। সাধ্য কি কোথাও টু শব্দটী হয়,—এমনি কড়াকড় শাসন রাজার। লোকে চুপি চুপি দিনরাত বলাবলি করতে থাকে। রাজাত রাজা আমাদের পুরঞ্জয় সিংহ, যার শাসনের দাপটে একেবারে সসাগরা মেদিনী কেঁপে ওঠে।

সহসা একদিন নগর মধ্যে প্রকাশ, যে কোথা থেকে এক অপূর্ব্ব শিল্পী এসে রাজধানীর অদূরে কারখানা খুলে বসেছে। রাজা শুনেই ভাবলেন বটে! অনেক ভাস্কর চিত্রকরকে ত পরখ করা গেছে। এবার দেখা যাক্, এ লোকটার বিদ্যার দৌড়ই বা কত দূর।

আর কি! রাজা রাজড়ার কাণ্ড ত! চিন্তা মাত্রেই কাজ। অমনি আদেশ হল প্রতিহারীর উপর 'যাও! শিল্পীকে নিয়ে এসো রাজসভায়।'

এদিকে রাজার রাণী পরমাসুন্দরী। এমন কি তাঁর জোড়া নাকি ভূভারতে নাই। রাজা এই নশ্বর নারীর একটী অবিনশ্বর মূর্ত্তি কিম্বা

আলেখ্য তৈরী করবার মতলব অনেকদিন থেকেই করেছিলেন। কিন্তু কেউই কৃতকার্য্য হতে পারেনি। তবু রাজা ছাড়বার পাত্র নন্। তিনি অনেক রকম ভেবে চিন্তেই শিল্পীকে তলপ দিলেন।

২

অরুণ-বর্ণ তরুণ-শিল্পী রাজসভায় এসে উপস্থিত। হঠাৎ রাজসভার মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল। সভাসদ্দের ভেতরে অনেকেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শিল্পী রাজচরণে প্রণাম করে হেঁট মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। পার্শ্বের বাতায়নের অন্তরাল থেকে ভূষণ শিঞ্জন এসে সকলের কাণে টুং টাং শব্দে বেজে উঠল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি চিত্রকর—না ভাস্কর ?"

মৃদুস্বরে উত্তর এল "ভাস্কর।"

"পাথর থেকে মূর্ত্তি কেটে বের কর্ত্তে পার ?"

"কি করে বল্ব মহারাজ, আপনার আদেশ।"

"বুঝেছি।—কঞ্চুকি !"

অবিলম্বে কঞ্চুকী এসে উপস্থিত।

"সব প্রস্তুত ওদিকে ?"

"আজ্ঞে মহারাজ"—জোড় হাতে কঞ্চুকী দাঁড়িয়েছিল এক পাশে।

"রাণীর সখীকে বোলো সব ঠিক ঠাক করে রাখতে।"

"যথা আজ্ঞা মহারাজ !"

"সময় মত সঙ্কেত ধ্বনি শুন্তে পাবে,—এখন যেতে পার।"

কঞ্চুকী চলে গেল।

মুহূর্ত্ত পরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। অবিলম্বে দেয়ালে টাঙ্গানো দর্পণের কালো পর্দাটা সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কক্ষ দ্বারও মুক্ত হল। দেখতে দেখতে দর্পণের উপর একটা আলোর ছটা যেন এসে ঝল্‌মল করে উঠল। শিল্পী ও সভাসদগণ চকিত-নেত্রে একবার সেদিকে তাকাল মাত্র। কিন্তু সে কতক্ষণ? চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ভোজবাজীর মতন অমনি সব অদৃশ্য। দর্পণের উপর কালো ঢাকাটা পড়ে' গেল। সশব্দে পাশের কক্ষ দ্বারও বন্ধ হ'ল।

শিল্পী তখনও নতমুখে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে।

রাজা ডাক্‌লেন—"যুবক!"

"মহারাজ!"

"দর্পণে কি দেখলে?" যুবক নীরব। "পারবে ত এঁর পাষাণ মূর্ত্তি গড়তে?"

"আপনার আদেশ মহারাজ। এ দাস কি বলবে।"

"তবে এসো এখন,—তিন পক্ষ কাল সময় দেওয়া গেল।"

"মহারাজের জয় হোক্" ব'লে শিল্পী বিদায় হ'ল।

সমস্ত নগরময় একটা হৈচৈ পড়ে গেছে, এবারে রাজরাণীর একটা শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি গড়া হবে, হুবহু মানুষটী যেমন, ঠিক তেমনি। লোকজনের আর আনন্দ-কৌতূহলের সীমা নাই; অথচ শিল্পীর বাড়ীতে ঢুক্‌তেই দেখা যায়, ঘরদোর খালি, কোথাও দু'এক খানা বড় বড় পাথর পড়ে আছে, কোথাও বা টুক্‌রো টুক্‌রো পাথর ছড়িয়ে। হাতুড়ি, বাটালি, করাত, রং, তুলি, যেখানে সেখানে আগোছালো পড়ে রয়েছে।

দেখে শুনেই সবার তাক লেগে যায়। এ লোকটা কি পাগল নাকি!

শেষটায় রাজার কোপে পড়ে’ প্রাণটা খোয়াবে দেখচি। লোকজনে এইরূপই বলাবলি কর্ত্তে লাগল, কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে কেউই রাজার কাণে কথাটা তুল্‌তে পারলে না। ক্রমশঃ কৌতূহল বাড়তেই লাগল। দিনও এক এক করে’ কাট্‌তে লাগল।

৩

এদিকে এক পক্ষ গত হয়ে গেল। রাজার আর ধৈর্য্য ধরে না। ভাস্কর না জানি কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই গড়ে’ তুল্‌বে, তার জন্যে তাঁর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। সবে মাত্র এক পক্ষ, এখনও দু দুটো পক্ষ বাকী। কি করেই বা এই লম্বা দিন গুলো পেরিয়ে যাওয়া যাবে। একটা যেন দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীর সাম্‌নে খাড়া রয়েছে। দিন যাহোক্ একভাবে কাট্‌বেই, কিন্তু মূর্ত্তি কতদূর গড়াইল—যাক্‌গে অত করে ভাবতে পারা যায়না। ডাক প্রতিহারীকে!

প্রতিহারী এসে হাজির। আদেশ হ’ল তার ওপরে “যাও। গিয়ে দেখে এসো ভাস্কর তার কাজ কতদূর করে উঠল। মনে যেন থাকে, তিন পক্ষের এক পক্ষ কেটে গেছে।”

ঘাড় হেঁট করে প্রতিহারী চলে গেল।

বেলা তখন অপরাহ্ন। ভাস্করের ঘর-দোর বন্ধ। দেখে প্রতিহারীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নিশ্চয়ই সে পালিয়েছে। কিন্তু এ খবর কে রাজাকে দিয়ে নিজের গলাটা দেবে? খোঁজ খোঁজ! কিন্তু সারা সহরের মধ্যে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কেউ বলে “এদিকে গেছে,” কেউ বলে “ওদিকে যেতে দেখেছি—একটা লোককে।” শুনে শুনে

প্রতিহারীর মাথা গরম হয়ে উঠল। একজন শেষটায় বল্লে "হাঁ দেখেছি একটি লোককে যেতে ওই ওদিকে, সুন্দর চেহারা মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।"

সে দিক্‌টায় বিজন বন। বনের ভিতর এক প্রকাণ্ড হ্রদ। পাতার ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের সোণালী আভা এসে জলের উপর পড়ে মৃদু হাওয়া সুন্দর দোল খাচ্ছে। দু'একটা পাখীর গানও শোনা যায়। বনে ঢুকতেই তার গাটা ছম্ ছম্ কর্ত্তে লাগল।

হ্রদের কাছাকাছি আস্‌তেই তার কাণে গেল, 'দেবি আমার! আজ আমার দিকে মুখ তুলে চাও! যুগব্যাপী সাধনার পর এতদিনে আমি মনের মত আদর্শ পেয়ে তাকে চিত্তপটে এঁকে রেখেছি। এসো চিত্তপট হতে আমার পাথরের গায়ে। ফুটে ওঠো চন্দ্রের মত কলায় কলায় আমার বাটালির মুখে! এস এস ধরা দাও।'

কাছে গিয়ে প্রতিহারী দেখে, তরুণ ভাস্কর প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল উপবিষ্ট। তার ডাগর চোখ দু'টী জলে ভরা। প্রতিহারী ডাক্‌ল "ভাস্কর!" চোখ মেলতেই ভাস্কর দেখতে পেল, তার সাম্‌নে সশস্ত্র প্রতিহারী। "কি ভাই?"

উত্তর শুনে প্রতিহারীর মনটা গলে গেল। মনে করে এসেছিল 'মস্ত একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে, তা হ'ল না।

ভাস্কর ধীরে ধীরে উঠে এসে প্রতিহারীর দু'টী গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল "কি মনে করে অধমের কাছে ভাই?"

প্রতিহারী উত্তর করলে, "তিন পক্ষ কালের মধ্যে এক পক্ষ কেটে গেল'—আর সবে দু'পক্ষ বাকী,—মূর্ত্তি কতদূর হ'ল গড়া?"

ভাস্কর নিরুত্তর হয়ে নখ খুঁট্‌তে লাগল। চুপচাপ থাক্‌লে ত চল্‌ছে না ভাই! রাজার হুকুম যে বড্ড কড়া তাত জানো?"

একটু ম্লানহাসি হেসে ভাস্কর বল্‌লে "ভয় কি ভাই। আরো ত দু পক্ষ সামনে আছে।"

দু'জনে ধীরে ধীরে তখন বন হতে বেরিয়ে এল।

৪

দেখতে দেখতে আরও এক পক্ষ কেটে গেল। আশায় নিরাশায় রাজার বুকটা ভরে উঠ্‌তে লাগল। দণ্ড পল ক'রে তিনি দিনগুণ্‌তে লাগলেন। দিনরাত শিল্পীর বাড়ীতে কেবল লোকের ভিড়। তার কিন্তু এদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ নাই। সাম্‌নের দরজা বন্ধ, ভেতরে কেবল ঠুক্ ঠাক্ শব্দ চল্‌ছে। যারা যায়, তারা আশায় বুক বেঁধে ফিরে এসে রাজাকে বলে, "শিল্পী এবারে খুব উঠে পড়ে লেগেছে মহারাজ।"

শেষের সপ্তাহও যায় যায়। আর মাত্র তিন দিন বাকী। রাজার আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ। কেবল মনে একমাত্র ভাবনা তিনটে মাত্র দিন সাম্‌নে, ভাস্কর যে কি ক'রে উঠ্‌ল, বুঝতে ত পাচ্ছিনে। রাণীর সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ।

শেষ দিন খুব সকালেই রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আজ আর কাউকে বলা কওয়া নেই। সামান্ত বেশ ভূষায় সেজে-গুজে একাই বেরিয়ে চল্‌লেন—একেবারে রাজধানী ছেড়ে ভাস্করের পর্ণকুটীর অভিমুখে। রোজকার মত আজও সাম্‌নের দোর বন্ধ। তবে পাশের একটা গবাক্ষ খোলা। তারই ভিতর দিয়ে প্রাতঃ-সূর্য্যের সোণালি কিরণ কুটীরের মধ্যে একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছে। তারই একটু অদূরে অন্ধকারে তরুণ-ভাস্কর বসে জোড়হাত, নিমীলিত চোখ' দু'টী গণ্ডে জল

ধারা। তার ওষ্ঠাধর ঈষৎ কাঁপছে...না না কাঁপ্‌ছে নয় শুধু···ওই যে বিড় বিড় করে কি বল্‌ছে না? হাঁ হাঁ—ওইত স্পষ্ট শোনা যচ্ছে···।

রাজা কাণ পেতে শুন্‌তে লাগলেন "দেবি আমার! সাধনার নিধি আমার! এইত তুমি ফুটে উঠেছ—আমার বাটালির মুখে তুলির মুখে বর্ণে বর্ণে রেখায় রেখায়! অসীম সৌন্দর্য্য! তুমি রাজরাণীর দেহে আশ্রয় পেয়ে আমার মর্ম্মের মাঝে শতদলের মত ফুটেছিলে,—সেখান থেকে তোমায় তুলে এনে তিল তিল করে আমি গড়ে তুলেছি। এইবার আমার চৈতন্য তোমাতে জাগুক্! তুমি কথা কও—কথা কও।"

রাজা শিউরে উঠলেন। সত্যিই ত রাণীর মূর্ত্তি।···মুহূর্ত্তে যেন পাষাণ প্রতিমার ওষ্ঠ কেঁপে উঠ্‌ল।

ঝড়ের বেগে তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলে গেল। উন্মত্তের মত রাজা ছুটে গেলেন ঘরের ভিতরে প্রতিমার সম্মুখে! "রাণি! এই তোমার কাজ! দরিদ্র ভাস্করের ঘরে তুমি পালিয়ে এসেছ!" ক্রোধান্ধ রাজা সজোরে ধাক্কা দিতেই পাষাণ-মূর্ত্তি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল।

ভাস্কর চীৎকার করে উঠ্‌ল "কি করলেন রাজা' কি করলেন?" মাথায় হাত দিয়ে রাজা সত্যি সত্যিই সেখানে বসে পড়লেন একেবারে ধূলো বালি আবর্জ্জনার মধ্যে। "সত্যিইত কি করলুম! তৎক্ষণাৎ চোখের পলক পড়তে না পড়তে ভাস্কর ছুটে গেল তার পাশের কক্ষে। যখন ফিরে এল তখন তার হাতে শাণিত ছুরিকা—ঠিক করালীর হাতের কৃপাণের মত।

ভয়ে রাজা থমকে গেলেন। রাজাকে অভয় দিয়ে সে উচ্চকণ্ঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তু'লে ব'লে উঠ্‌ল "মহারাজ! আজ আমার সফল-সাধনা। বহু জন্মের সাধনার ফলে এতদিন পরে আমারি কাম্য বস্তুকে পেয়েছি। আর কেন?···জীবনের কাজ যখন আজ আমার সাজ

হয়েছে, তখন আর জীবনের বোঝাটাকে মিছেমিছি বয়ে বেড়িয়ে লাভ কি? আপনি যে রসের সন্ধান পেয়ে মূর্ত্তিটাকে চুরমার করে আমাকে পুরস্কৃত কর্লেন এরূপ পুরস্কৃত বোধ হয় লক্ষ রত্ন দানেও কর্ত্তে পারতেন না। রূপ নাই সৌন্দর্য্য আছে,—রইবে এ সৌন্দর্য্য অমলিন হয়ে, চিরজীবন ধ'রে মর্ম্মে মর্ম্মে অমল শতদলের মত।···যাই রাজা!" বল্‌তে বল্‌তেই ঝল্‌মল্‌ করে ছুরি খানা উঠ্‌ল একবার। মুহূর্ত্তেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তরুণ ভাস্কর সেই চূর্ণ প্রতিমার পদতলে লুটিয়ে পড়ল। তখন তার বুকের ভিতরে ছুরি বসানো। রক্ত ঝিন্‌কি দিয়ে দিয়ে উঠ্‌ছে। "কি করলে— কি করলে" রাজা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। "কি আরাম! আজ আমার সফল-সাধনা! আঃ—"সব শেষ হয়ে গেল। নিরুপায় রাজা তখন চূর্ণ প্রতিমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়তে বসে গেলেন। এদিকে প্রাতঃসূর্য্য ফিক্ ফিক্ করে গবাক্ষ পথে হাস্‌তে লাগল।—

পুনর্মিলন

১

সন্ধ্যাবেলা আফিস হইতে ফিরিয়া নিতাই যেদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিত যে ভাইপো রাখাল বেশ নির্ব্বিঘ্নে পিসীমার সহিত দিন কাটাইয়াছে, সেদিন নিতাইয়ের মনে আর কোন উদ্বেগ থাকিত না,—সে অমনি তাড়াতাড়ি হুঁকাটা ধরিয়া খানিকক্ষণ মনের সুখে তামাকু সেবন করিতে করিতে দিনের কাজকর্ম্মের একটা হিসাব নিকাশ করিয়া ফেলিত, সঙ্গে সঙ্গে মনে করিত যে তামাকুর ধূমের মতই জীবনটাকে অত শীঘ্র উড়াইয়া দিবে।

নিতাই দিনের বেলায় আফিসে চলিয়া গেলে রাখালের মত অত্যাচার, জুলুম আরম্ভ হইত ভাল মানুষ পিসীমাটীর উপর। অম্লান বদনে তিনি সব সহ্য করিয়া যাইতেন, ঘুণাক্ষরেও কোনও দিন ভাইকে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে দেন নাই। তার মনের একমাত্র ধারণা 'বড় হলে সব সেরে যাবে।' দুই একদিন তিনি একটু বিরক্ত হইয়া নিতাইকে সব বলিয়া দিতেন। নিতাই সেদিন কড়া মেজাজ লইয়া রাখালকে পড়াইতে বসিত। নিতাই যে ভাইপোকে শাসন করিত না, এমন নয়: কিন্তু অতিরিক্ত শাসন করিতে গেলেই রাখালও কাঁদিয়া ফেলিত, আর তারও যে বুকের কোনখানটায় বাজিত, তা কেবল শুধু সেই জানিত।

রাখালের খুব ছোটবেলায় মা মারা যায়। বাপ ছিল, সেও আজ দুই বছর হইল মারা গিয়াছে। মরণকালে পুত্রটীকে তিনি ভ্রাতার হাতে হাতে দিয়া বলিয়া যান, "ভাই আমিও চল্‌লাম, রাখাল রইল, তোমাকে

দিয়ে গেলাম। তুমি আর দিদি, এই দু'জন ছাড়া ওর আর ত্রিসংসারে কেউ রইল না—বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া আসে। নিতাই অমনি রাখালকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া চোখের জলের ভিতর হইতে উত্তর দেয় "দাদা! সত্যিই আমাদের ছেড়ে চল্‌লে। তোমার অভাবে রাখালও আমার বাঁচবে ভাল।"

স্ত্রী বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলাই নিতাইয়ের বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু নিতাই গোঁ ধরিয়া বসে। সে তখন বলিয়াছিল "দরকার কি দাদা! আমার রাখাল বেঁচে থাকলেই বংশে বাতি জ্বল্‌বে। দিদি আছেন বিধবা, তাঁরও কেউ নেই, বরং তাকেই নিয়ে আসা যাক্।" ভ্রাতার কথায় বলাই আর বেশী আপত্তি না তুলিয়া দিদিকেই সংসারে লইয়া আসিলেন। দাদা জীবিত থাকিতেই নিতাই কোনও সওদাগরী আফিসে চাকুরী লইয়াছিল। সুতরাং এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর অন্ন-বস্ত্রের কোনই কষ্ট ছিল না। পিতৃ-মাতৃ-হীন রাখাল পিসীমার আদর যত্নে মানুষ হইতে লাগিল।

কিন্তু অদৃষ্ট কে খণ্ডন করিবে? কিছুদিন পরে একদিন রাখালের পিসীমা মারা গেলেন। পাড়ার বন্ধু-বান্ধবেরা নিতাইকে বলিতে লাগিল, এবার আর একটা বে-থা না ক'রে থাকতে পার না। নিজে আফিসই করবে, না ভাইপোকেই দেখ্‌বে, না রান্না-বান্নাই করবে?" নিতাই উঁচু গলায় বলিল "হ্যাঁ রান্না-বাড়ার জন্যে বে করতে হবে আবার! কেন—একজন রাঁধুনী রাখলে চলে না!"

কিন্তু সেই দিন বিকালে সে একটু বিলম্ব করিয়া আফিস হইতে ফিরিল। রাখাল মনে করিল 'কাকা ঝি রাঁধুনী খুঁজতে গেছলো, তাই আস্‌তে রাত হয়ে গেছে।' কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পরদিন সকালবেলা যখন একটী নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল,

তখন রাখালের আর আনন্দ ধরে না। সে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, "হেঁ বামুন ঠাক্রুণ! আজ থেকে তুমি আমাদের বাড়ীতে রাঁধবে?"

স্ত্রীলোকটী বলিল "আমি রাঁধুনী নই।"

"তবে তুমি কে?"

"আমি ঘট্‌কী।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে রাখালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ঘট্‌কীর আগমনে যে কিছু একটা নূতনত্বের আশু সম্ভাবনা আছে; এ ধারণাটী তাহার মনে বদ্ধমূল হইল। কি যে একটা হইবে না হইবে, তাহা সে ঠিক বুদ্ধির দ্বারা ঠাহর করিতে পারিল না,—কিন্তু কিছু একটা যে ঘটিবে, সে বিষয়ে তাহার অনুমাত্রও সংশয় রহিল না, কত রকম করিয়া মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিয়া দেখিল, কিছুতেই একটা কিছুর মীমাংসা করিতে পারিল না। তার ত এই সবে ১৬ বছর বয়স। এ বয়সে তার জন্যেই বা ঘট্‌কীর কি প্রয়োজন! তবে বোধ হয় তাহার কাকার জন্যে। হাঁ, সেইটাই ঠিক। এবার মনকে যত রকম করিয়াই প্রশ্ন করুক্ না কেন,—ওই একই উত্তর, "হাঁ কাকারই জন্যে।"

২

দুই একদিনের মধ্যেই পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, যে নিতাই বাঁড়ুয্যে ও পাড়ার ফকির চাটুয্যের কুলরক্ষার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। নিতাই বন্দ্যঘটী বংশ রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান,—তাহার মতন একটি স্বভাব কুলীন সচরাচর মেলে না। ফকির চাটুয্যে বেচারীরও ৫৬ পুরুষ নিরয়গামী হইতে বসিয়াছেন,—এমন সময় সুযোগটী ঘটিল ভাল। পূর্ব্ব

পুরুষকে অনন্ত নরকের মুখ হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত একটী লোক মিলিল। বন্ধু বান্ধবেরা হাসিয়া নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল “কি হে ভায়া! রাঁধুনী রাখবে তার কি হল? তখন না আমরা ব’লেছিলাম, কথাটা তখন তত গা করনি, এখন কি হচ্ছে বলত দেখি?” নিতাই নিতান্ত অপ্রতিভের মত থাকিয়া বলিল, কি করব ভায়া! আমার মতন একটা কুলীন বেচারী কোথাও পেলেনা যে! পৈতে দিয়ে হাতে জড়িয়ে ধরে বললে বাপু! আমার কুলরক্ষা করতেই হবে! এতকাল উঁচু ঘরে কাজ করে এখন কি ৫৬ পুরুষকে নরকে ডুবিয়ে দেবো? এখন বলত আমার দোষটা কোনখানে?”

বন্ধুদের মধ্য হইতে বিপীন বলিয়া উঠিল “সাধু-সাধু! পরোপকারায় সতাং হি জীবনম।”

কয়েক দিনের মধ্যেই যখন নোলক পরা একটী কিশোরী-বধূ নিতাই-য়ের শূন্য ঘর পূর্ণ করিতে আসিল, তখন রাখাল ঘটকীর শুভাগমনের শুভফল প্রত্যক্ষ করিল। যাক্ বেচারী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

নতুন কাকীমাকে রাখাল বেশ প্রীতির চক্ষেই দেখিল। কাকীমার সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। পড়িবার জন্য বাংলা বই আনিয়া দেয়। ইস্কুল হইতে আসিয়া খুব ঘটা করিয়া খুড়ীমার নিকট হইতে জলখাবার চাহিয়া লয়।

দেখিয়া শুনিয়া নিতাইয়ের ভারী আনন্দ হইতে লাগিল। নিতাই আফিস্ করে রাখাল ইস্কুলে যায়, নূতন বধূ ঘর সংসার করে। এইরূপ করিয়া ৩।৪ বৎসর অতিবাহিত হইল।



নিতাইয়ের স্ত্রীর নাম রমা। বহুদিন পরে এবার পিত্রালয়ে গিয়াছিল প্রসবের জন্য। তিন মাসের একটী শিশু পুত্র ও রুগ্নশরীর লইয়া রমা যখন স্বামী-গৃহে আসিল, তখন আর সে রমা নাই। বাহিরের মানুষটীর সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতরকার মানুষটীও বদলাইয়াছে। ইহা সকলের চেয়ে রাখালের চোখেই পড়িল বেশী। তাহার আগেকার সেই খুড়ীমা'টী আর নাই, তাহার স্থানে যেন কত কালের অপরিচিত এক রুক্ষ-মেজাজী নারী আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাহার সঙ্গে যেন এতটুকু সম্বন্ধও তার নাই।

বাস্তবিকই রমা অনেক বদলাইয়াছে। তাহার মুখে আর আগের মতন যখন তখন হাসি নাই। সংসারের কাজ-কর্ম্মেও আর তেমন তার মন বসে না। দেখিয়া শুনিয়া নিতাই একদিন বলিয়া ফেলিল, "তোমার কি হয়েছে বলত? আগের চেয়েতে ঢের রোগা ত হয়ে গেছই; কিন্তু প্রায়ই খাওনা রাত্রে উপোস করে থাক—এর মানে কি বলত?" রমা মুখ নীচু করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। নিতাই বুঝিতে পারিল—ব্যাপার তত ভাল নয়, আর কোন কথা না বলাই ভাল। সে নীরবে সেখান হতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় শুনিতে পাইল, রমা বলিতেছে "বাপের বাড়ী থেকে এসে মরতে বসেছি দেখচি। অনাহারে অচিকিৎসায় কতদিন আর এ সংসার চালাবে?" কথাটা নিতাইয়ের কাণে গিয়া বাজিল, বুঝিবা সে সঙ্গে বুকেও গিয়া বাজিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল "দেখ এই ক'দিন ধরে ত আমাকে

কোন কথা বলনি,—তা না পার কাজ-কর্ম্ম নাই বা করলে। এক বেলা দু'টী করে রেঁধে রেখে দিয়ো, তাই নয় ও বেলাও আমরা খাব। তোমার জন্মে আমি দুধ আর রুটীর বন্দোবস্ত করব।" নিতাই সহানুভূতির রসে অভিষিক্ত করিয়াই কথাগুলি বলিল। রমারও মনটা অনেক নরম হইল। সে তখন বলিল "বিকেলে জল খাবার না হ'লে যে চল্‌বেনা।"

নিতাই রুক্ষ-স্বরে বলিয়া উঠিল, "যার না চলে, সে নিজে ক'রে থাক্ গে! আমার বেশ চল্‌বে রমা!"

সে দিন বিকালে রাখাল বাড়ী আসিয়া আর জলখাবারের থালা হাতে খুড়ীমাকে দেখিতে পাইল না। রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, কেউ নাই। আস্তে আস্তে উপরের ঘরে গিয়া দেখে, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া খুড়ীমা শুইয়া আছেন।

"কাকীমা—ও কাকীমা! তোমার অসুখ করেচে?" বলিয়া রাখাল খুড়ীমার মাথায় হাত দিয়া দেখিল, মাথা ত গরম নয়। বরং কাপড়-চোপড়ের কৃত্রিম উত্তাপে বিন্ বিন্ করিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেন যে খুড়ীমা এমন করিয়া শুইয়া আছেন, তাহা ত তার বুদ্ধির অগম্য। কোলের কাছে খোকা ঘুমাইয়া আছে।

দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করার পরও যখন সে দেখিল, যে খুড়ীমার কথা বলার আদৌ মতলব নাই, তখন সে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইল। খোলা ছাদের উপর গিয়া পায়চারি করিতে করিতে অতীত জীবনের ঘটনাবলীর উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া গেল। পিতা, মাতা, পিসীমা, যাঁদের কথাই মনে আসে, অমনি বুকটার মধ্যে কেমন করিতে থাকে, আর চোখের কোণে কোণে আসিয়া জল জমা হইয়া

উঠে। এমনি করিয়াই কিছুক্ষণ তাহার কাটিল। সত্যই কি খুড়ীমার তেমন কোন গুরুতর অসুখ হইয়াছে, যার জন্য এমন অসময়েও তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? শীতকালের সূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়। একটু একটু করিয়া অন্ধকার রাত্রি পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহার হিমসিক্ত অঞ্চল-প্রান্ত বাতাসের ঝাপ্টায় আসিয়া রাখালের গায়ে লাগিতেছিল। তবুও তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে জাগিতে লাগিল, কেবল ওই একই কথা, শরীর ঠাণ্ডা, অথচ জ্বর হয়েছে ব'লে শুয়ে আছেন, রহস্যও ত বড় মন্দ নয়। এর মূলে সত্য সত্যই কাকা ত নাই। যে এফ্.এ পরীক্ষায় পাশ জলপানি পাইয়াছে তার ত বাড়ীতে বেশী করিয়া জলপানি পাবার কথা, সে জায়গায় যে এমন উল্টা ব্যবস্থা হইতে পারে, এ'ত তার কোন দিন কল্পনায় আসে নাই। কিছুক্ষণ এইরূপ সে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় নিতাই দপ্‌দপ্ করিয়া উপরে আসিয়া বলিল "তোমার আক্কেলটা কি বলত বাপু! একজন জ্বর হ'য়ে পড়ে' আছে, আর তুমি এখানে দিব্যি পায়চারি করছ।" নিতাই কোনদিন রাখালকে তুই ছাড়া তুমি সম্বোধন করিত না। আজ হঠাৎ এইরূপ নূতন সম্বোধন শুনিয়া সে থমকিয়া গেল। সে অপরাধীর মত বলিল "আমি ত কাকীমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লুম জ্বর নাই।"

নিতাই রাগের ভরে বলিয়া উঠিল "হেঁ তুমি দেখেচ, না ছাই' করেচ, ঘরে আলোটা পর্য্যন্ত জ্বালোনি। নব্য-যুগের সভ্য ভব্য বাবু কিনা তোমরা!"

শেষের শ্লেষোক্তিটী তীরের মতন গিয়া রাখালের বুকে বিঁধিয়া বসিল। সে মাথা হেঁট করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া রান্নাঘরে উনান জ্বালিতে লাগিল।

ইহার পরেও রাখাল নিজ হাতে রান্না করিয়া খুড়াকে খাওয়াইয়া

পরে' নিজে খাইয়া কলেজে গিয়াছে, আর শুষ্কমুখে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রান্না করিয়াছে। নয় অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকিলে খুড়ীমার রান্না খাইয়াছে। কিন্তু খাওয়া ত নয় বিষ গলাধঃকরণ করা। একদিন খুড়ীমা স্পষ্ট বলিলেন "আমি রাঁধ্‌তে পারব না। আমার শরীর দিন দিন যেরূপ খারাপ হচ্ছে, এতে দেখ্‌চি যে মা বাপের কাছে না গেলে আর বাঁচব না।" কথাটা শুনাইয়া শুনাইয়া নিতাইকে বলা হইল। নিতাই সহানুভূতির স্বরে বলিল "বাস্তবিকইত, তোমাকে মেরে' ফেল্‌তে এখানে এনেছি। কি করব বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।" রাখাল সেখানে ছিল, সে বলিয়া উঠিল "আচ্ছা, একজন রাঁধুনী রাখলে হয় না?"

নিতাই রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "মাইনে কে দেবে?"

রাখাল। কেন আমরা দেবো।

নিতাই। দেবে ত নিয়েই এস না কেন!

রাখাল দৌড়িয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে উড়ে বামুন লইয়া আসিয়া উপস্থিত। রাঁধুনী বামুন দেখিয়াই নিতাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। রমা বিরক্ত হইয়া গিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নিতাই জিজ্ঞাসা করিল "মাইনে ঠিক করেচ?"

রাখাল বিনীতভাবে উত্তর করিল "সে আপনি থাকতে আমি কি ঠিক করব?"

"বটে! আমার রাঁধুনীর কোন দরকার নাই" বলিয়া নিতাই ভয়ঙ্কর রাগান্বিত হইয়া উঠিল।

স্পষ্ট জবাব শুনিয়া 'পাণ্ডাঠাকুর' চলিয়া গেল। সেদিন আর রান্না হইল না। নিতাই না খাইয়াই আফিসে চলিয়া গেল। রাখালও কতক্ষণ কি চিন্তা করিল, পরে অভুক্ত অবস্থায়ই বিষণ্নমুখে ধীরে ধীরে কলেজ-মুখো রওনা হইল।

৪

সন্ধ্যার সময় নিতাই আফিস হইতে আসিয়া দেখে, তখনও রাখাল কলেজ হইতে ফেরে নাই। উপরে গিয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্তোষ জনক উত্তর পাইল না। মনে ভাবিল, রাগ করিয়া গিয়াছে, একটু দেরীতে রাগ কমিয়া গেলে নিশ্চয়ই ঘরের ছেলে ঘরে আসিবে। অমনি তাড়াতাড়ি নিতাই গিয়া পাকের আয়োজন করিতে বসিল। রমা সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "আবার তুমি সারাদিনের হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর পর রাঁধতে এলে কেন? আমিই নয় দু'টো যা তা' যেমন তেমন করে' নাবিয়ে দিচ্ছি, তুমি যাও, একটুখানি জিরোও গে।"

নিতাই স্ত্রীর কথায় একটুখানি নরম হওয়া দূরে থাক্, বরং বিলক্ষণ গরম হইয়াই উত্তর করিল "এসো না এখানে বল্‌চি!"

রমা ভয়ে ভয়ে সেখান হইতে সরিয়া গেল। পুরুষ মানুষ হইয়াও নিতাই আজ কত যত্নে রান্না করিল, আর এক একবার দরজার দিকে তাকাইতে লাগিল। কই, কারও ত পায়ের শব্দ শোনা যায় না। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া সে একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। হেদোর ধার, মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মোড়, আমহার্স ষ্ট্রীট্ ঘুরিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। নিতাই আসিল, উপর নীচের ঘর তেমনি শূন্য। কেবল তাহার শয়ন কক্ষে রমা শিশুপুত্রটীকে কোলে করিয়া শুইয়া আছে। রমা জিজ্ঞাসা করিল "খাও নি?"

নিতাই গম্ভীরভাবে কহিল "খাই নি, তা' তুমি কি করে জান্‌লে?"

রমা। "আমি একটু আগে নীচের গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি কেউ নাই, রান্নাঘরে সব ঢাকা পড়ে আছে। এর মধ্যে এসে কি আর খাওয়া সম্ভব ?"

নিতাই। না আমি খাব না।

রমা। কেন খাবে না ? তাহলে অত কষ্ট করে' রাঁধবার কি দরকার ছিল ? তাঁকে বুঝি কোথাও পেলে না ?

নিতাই। বিরক্তির ভরে দেখ রমা! সব কথার সকল সময় জবাব দেওয়া যায় না। এই বুঝেই আমাকে আর কোন প্রশ্ন কোরোনা।

রমা চুপ করিয়া গেল। নিতাই রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া উপরের একটা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। রাখালের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণাও যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকাল বেলা রাখালের ঘরের দরজার গোড়ায় একখানা চিঠি পড়িয়া আছে দেখা গেল। নিতাই চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু—

কাকা! আজ আপনার সংসার হইতে বিদায় হইলাম। যদি ভগবান্ দিন দেন ত, আবার দেখা হইতেও পারে। কিন্তু যতদূর পারি, নিজেকে দূরে দূরে রাখিতেই চেষ্টা করিব। মা বাপ ছিলেন না, আপনি ছিলেন, বলিতে কি আমার সকলি ছিল, কিন্তু যখনই দেখিতে পাইলাম, মা-বাপের মতন আপনাকেও একটু একটু করিয়া হারাইতে বসিয়াছি, তখনই আর আপনার সংসারের মধ্যে আমার নিজের জন্যও ঠাঁই খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার শত শত অপরাধ স্নেহবশে ক্ষমা করিবেন। অকৃতী হই, অধম হই, তবু আমি আপনারই, এই কথাটুকু মনে রাখিলেই সুখী হইব।

সেবক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

পত্র পড়িয়াই নিতাইয়ের বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। একে একে অতীতের দিনগুলি মনে পড়িতে লাগিল। ভ্রাতৃবধূর মৃত্যু, জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু, দিদির মৃত্যু—নাটকের দৃশ্যের ন্যায় একটীর পর একটী করিয়া তাহার চোখের সাম্‌নে যেন ভাসিতে লাগিল। হায়! কোথায় আজ তাহার সেই পণরক্ষা! কোথায় আজ তাহার সেই সগর্ব্ব উক্তি—'দাদা! রাখাল বেঁচে থাকলেই বংশে বাতি জ্বল্‌বে!' নিজের চোখেই যে সে আজ এতটুকু হইয়া গেল।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিতাই নয়টা বাজিতেই আজ জামা কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। পূর্ব্ব রাত্রের অনাহারের দরুণ শরীর যদিও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তবুও শরীরের প্রতি তার দৃষ্টি নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা পথ চলিবার পরই ফ্রিচার্চ কলেজের সাম্‌নে আসিয়া সে পৌঁছিল। তখনও কলেজে ছাত্রদের তেমন ভিড় হয় নাই। দুই একজন ছাত্র আসিয়াছে মাত্র। ফটকের এক পাশে কোন রকমে সে মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, ২।১ জন করিয়া ছাত্রও ফটক পার হইয়া কলেজে ঢুকিতে লাগিল। কিন্তু যাহার অপেক্ষায় সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে ত দেখিতে পাইল না। বেলা প্রায় এগারটা বাজে বাজে, এমন সময় তার চোখে পড়িল, আর দুইটী কলেজের ছেলের সহিত গল্প করিতে করিতে রাখাল আসিতেছে। একবার ইচ্ছা হইল নিজেই যাইয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে। কিন্তু আবার ভাবিল, তাহা হইলে অপর ছেলে দু'টীই বা কি মনে করিবে। রাখাল যে ভাইপো হয়, এ কথাটা ত আর অপ্রকাশ থাকিবে না। নিজেদেরই একটা লজ্জার কথা লোকের কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে। কিন্তু রাখাল কি নিষ্ঠুর! নিতাই এমন করিয়া দুইটী চক্ষু দিয়া তাহাকে প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, আর সেকি একটীবারও এ বেচারীর দিকে

চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না। নিতাই বুঝিল উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে।



কয়েকদিন পরে হলুদের ফোঁটাযুক্ত এক পত্র আসিয়া নিতাইয়ের নামে উপস্থিত। পত্রে লেখা আছে—

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার শুভ গোধূলি লগ্নে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রাখালদাস দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার কন্যা শ্রীমতী শশিকলাদেবীর শুভ বিবাহ মদ্ বাসস্থলীতে সুসম্পন্ন হইবে। মহাশয়! অনুগ্রহ পুরঃসর বরকর্ত্তারূপে উক্ত দিবস মমালয়ে উপস্থিত হইয়া শুভকার্য্য সমাধা করিবেন। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। লিপিদোষ মার্জ্জনীয়।

নিবেদক—
শ্রীউমাকালী দেবশর্ম্মা হালদার।
১০।৬ পটুয়াটোলা লেন।

পত্র পড়িয়াই নিতাই একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। উমাকালী একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী। কলিকাতা সহরে তাহার ৪।৫ খানা বাড়ী, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন কত কি।…তা থাক্, উমাকালীর রাজার রাজত্ব থাক্, তাই বলিয়া সে টাকা দিয়া তার ভাইপোকে কিনিয়া লইবে! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! সংসারে টাকাই এত বড়! না—না উমাকালীর কোন দোষ নাই। দোষ যত রাখালেরই। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিতাই এই কথাগুলি ভাবিয়া লইল। পরে পত্র বাহককে বিদায় দিয়া দড়াম্ করিয়া

ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। রমা ব্যাপারটা ভালমত বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি যেন !"

নিতাই সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া দ্বার রোধের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও হৃদয়ের দোরে যেন বেশ মজবুত করিয়াই কুলুপ আঁটিয়া দিল। এখানে ভিতরকার কথাটা একটু বলিতে হইতেছে। উমাকালীর পুত্রদের সঙ্গে রাখাল বি, এ ক্লাসে পড়ে। তাহাদের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব।

অনেক সময়েই তাহাদের বাড়ীতে তাহার নিমন্ত্রণাদি হইয়া থাকে। রাখাল ছেলেটি লেখাপড়ায়ও যেমনি ভাল, তেমনি সচ্চরিত্র ও সুন্দর। বহুদিন হইতেই ইহার উপর উমাকালীর কেমন নজর পড়িয়াছিল। শশিকলা রাখালের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। সুন্দরী বলিতে যাহা বুঝায় সে তাহা আদৌ নয়। তাহার রূপের মধ্যে চোখ দুইটীর উজ্জ্বলতা সাধারণতঃ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে তাহার স্বভাব যেরূপ মধুর, তাহাতে রূপের প্রশ্ন বড় একটা মনেই জাগে না। একটী দিনের একটু ব্যবহারেই তাহার প্রতি মুগ্ধ হইতে হয়। উমাকালীর ঐ একই মেয়ে শশিকলা। তাঁহার বরাবরই ইচ্ছা যে, একটী সৎপাত্রের হাতে মেয়েটীকে দিয়া নিজের একখানা বাড়ী ও কিছু কোম্পানীর কাগজ তাহার নামে দানপত্রে রেজেষ্ট্রী করিয়া দেন। রাখাল যে উঁচু ঘরের ছেলে, তিনি তাও জানিতেন। ইহাকে উহাকে দিয়া কতবার তাহার কাছে প্রস্তাব করিয়াছেন ; কিন্তু সে কেবল একই উত্তর দিয়াছে যে, কাকার মত না হইলে তাহার কোনই হাত নাই। কিন্তু একটি দিনের একটি ঘটনায়, সেই কাকার মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে ! আত্মসম্ভ্রম হারাইয়া নিতান্ত হীনের মত যখন সে আসিয়া, এ কথায় সে কথায় উমাকালীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিল, তখন তিনি হাত বাড়াইয়া যেন স্বর্গ পাইলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া উমাকালী নিতাইকে

পত্র লেখেন। খুব জাঁক-জমকের সহিতই বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নিতাই আসিল না, তাহার বংশমর্য্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে। কোথাকার কে উমাকালী হালদার, ব্রাহ্মণ কি না তারও পরিচয় নাই, সেই কি না তার ভাইপোকে টাকা দিয়া কিনিয়া লইল! ধিক্ তাহাকে! আর শত ধিক্ তাহার সেই কুলাঙ্গার ভাইপোকে! যে এই সকলের মূল! অমন পাপিষ্ঠের মুখদর্শনেও পাপ! ক্রোধে অভিমানে তাহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল।

৬

স্নেহ চিরদিনই নিম্নগামী। নিতাইএর এই অভিমান বেশী দিন টিঁকিল না। রমার শত শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে আজ রাখালের বৌকে দেখিতে চলিল। নিতাইকে দেখিয়া রাখালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নিতাই কিন্তু রাখালকে অন্য কোন কথা না বলিয়া একেবারে সোজাসুজী বলিল, "বৌমাকে নিয়ে বাড়ী যেতে হবে।" রাখাল মহা বিপদে পড়িল, একটা ঢোক গিলিয়া সে বলিল, "একবার এঁদের কাছে তা'হলে—" নিতাই বলিল "তোমার শ্বশুরের কথা বল্‌ছ, তাঁর কাছে ত যাবই" বলিয়া নিতাই যেমন উমাকালীর সহিত দেখা করিতে যাইবে, অমনি বাধা দিয়া রাখাল বলিল "একটু বসুন, তাঁর এখন একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে।" নিতাই দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া বসিয়া কত কি মাথামুণ্ড ভাবিতে লাগিল "তাই ত! বড় লোকের বড় দস্তুর, তাঁর সঙ্গে দেখা করাই যে আমার পক্ষে মস্ত ধৃষ্টতা; বাবাজীও আমার ঠিক দুই দিনে তালিম হইয়া গিয়াছেন।" উমাকালী পাশের ঘরে দুই তিনটি মক্কেল বন্ধুর সহিত

মোকদ্দমা-সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার উচ্চ হাসির সহিত শোনা গেল—"তখন আস্‌তে পার্‌লেন না, এখন এয়েছেন আমাদের স্বর্গে তুল্‌তে! বৌমাকে নিয়ে যাবেন!—বলিহারী যাই সাহসের।" কথা কয়টি নিতাই স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কোথাও একটু জড়তা নাই, অস্পষ্টতা নাই—তপ্ত লৌহশলাকার মত আসিয়া সেগুলি তাহার কাণে বিঁধিতে লাগিল। রাখাল মুখ ভারী করিয়া আসিয়া বলিল, "তাঁর এখন দেখা কর্‌বার আদৌ অবসর নাই।" "ব্যস্ হয়েছে" বলিয়াই নিতাই যেমনি উঠিবে, রাখাল অমনি তাড়াতাড়ি তাহার সাম্‌নে আসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "রাগ ক'রে এমনি চলে যাবেন না, আমি তাঁকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লেই তিনি আপনার সঙ্গে দেখা না করে পারবেন না। একটু জরুরী কাজ আছে কিনা, তাই আস্‌তে পারছেন না।" নিতাই বিরক্তির সহিত বলিল, "থাক্ থাক্ আর তুমি ওকালতী কর্‌তে যেয়ো না।"

"যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু একদিন একথা মনে কর্‌তে হবে, তোমরা সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু আমার এ বাড়ীতে আসা এই শেষ।" বলিয়াই নিতাই বাহির হইয়া পড়িল। রাখাল সে খানে নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল। খুড়ার আশীর্ব্বাদ যেন ভীষণ বজ্র নির্ঘোষের মত এক মূহূর্ত্তে তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। যতদূর দেখা যায়, রাখাল চাহিয়া রহিল—চাহিয়া চাহিয়া তাহার কাকাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল! পরে যখন গলির মোড় ঘুরিলে আর দেখা গেলনা, তখন তাহার হৃদয় কি এক তীব্র বেদনায় ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। একবার মনে হইল, দৌড়িয়া গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া কাকাকে ফিরাইয়া আনে; কিন্তু তার সে শক্তি কোথায়? সে যে এখন বড় ঘরের জামাই। লোকের কাছে তাহা হইলে মুখ দেখাইবে

কিরূপে ? তেওয়ারী দারোয়ানটাই বা দেখিয়া কি মনে করিবে। ভাগ্যে সে দিন তাহার শ্যালকেরা বাড়ী ছিলনা, নইলে তাহাকে বিষম লজ্জা পাইতে হইত। কাকা আর এ মুখো না আসেন ত মঙ্গল। খুড়ার প্রতি তাহার শ্বশুরের এই অবজ্ঞা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। মুখে যদিও তাহার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, তবুও অন্তরে অন্তরে সে বুঝিল যে, এই অপমান খুড়াকে যেমন লাগিয়াছে, তাহার শতগুণ তাহাকে লাগিয়াছে। শ্বশুরের উপর তার একটা ভয়ানক ঘৃণা জন্মিয়া গেল। কিন্তু এই ঘৃণাকে পোষণ করিয়া এই শ্বশুর বাড়ীতেই শ্বশুরের অন্নে তাহাকে জীবন যাপন করিতে হইবে। ক্ষণকালের জন্যও অন্ততঃ এই চিন্তায় তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। ক্রমে তাহার বড় অসহ্য হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। একখানা গাড়ী করিয়া বরাবর নিজের বাড়ীর দরজায় গিয়া যখন পৌঁছিল, তখন বেলা সাড়ে নয়টা। গাড়ী হইতে নামিতেই দেখিল, নিতাই। রাখাল কাকার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিতাইএরও চোখের কোণে জল আসিয়াছিল। বহুকষ্টে তাহা মুছিয়া সে বলিল, "রাখাল, এমন করে চলে এলে, তোমার শ্বশুর শুন্‌লে কি মনে করবেন ?" রাখাল বলিল, "আমি আবার এখুনি যাব তাই গাড়ী ক'রে এ'য়েচি। আসুন গাড়ীতে।" নিতাই গাড়ীতে না গিয়া ফুট্‌পাথ ধরিয়া আফিসে চলিল। রাখাল মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে বলিল—"কই ? কাকাত আমাকে একটীবারও থাক্‌তে বল্লেন না। থাক্ তবে আর আমার দোষ কি ?" আগেকার কথাগুলিও তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইতে লাগিল। নিতাই ততক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল, রাখালের কথা। "রাখাল কি সত্য সত্যই আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল ? অথবা আসিলে অমন শুধু হাতেই বা আসিবে কেন ? কিংবা যদি মনের আবেগেই

আসিয়া থাকে! আমি ত তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না। এক দিনের একটা ভুলে যাহাকে হারাইয়াছিলাম, আজ তাহাকে হাতের মধ্যে পাইয়াও আর একটা মস্ত ভুলে হারাইলাম! আর কি সে আসিবে! কেনই বা আসিবে!"

৭

সেদিন সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিলে, রমা নিতাইকে বেশ শক্ত শক্ত দুই কথা শুনাইয়া দিল। নিতাই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "দেখ কাজটা আমার পক্ষে ত আর অন্যায় হয়নি; সে রাগ ক'রে চলে গি'য়ে সেধে ঘর-জামাই হতে গেল, আমার কি উচিত নয় যে তাকে ফিরিয়ে আনি?" রমা বলিল' "তখন আমার কথা শুনলে না, দেখত অপমানটা হল কার? তুমি হ'লে সমাজের মাথা' পায়ে ধ'রে যাকে নেওয়া যায়না, সেই কিনা নিজে সেধে গিয়ে এমনতর ছোট মুখে ফিরে এল! বাবা বলেন যে, রমা আমার সকলের ছোট মেয়ে, ওকে নিয়ে যেমন ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম, তেমনি ওকেই দিয়েছি সকলের চেয়ে উঁচু ঘরে।" নিতাই তামাকুটাকে নিঃশেষ করিয়া সগর্বে কহিল "সে কথা কি মিথ্যে, এমন ঘরে মেয়ে কয়জনে দিতে পারে! তবু তোমার বাবা আমাকে তেমন কি-ই বা দিয়েছিলেন! আজ কালকার দিনে বরের বাজার যেমন চড়া, আর কেউ হলে ২০০০৲ দু'হাজার টাকার কমে আর পেরে উঠতনা।"

"তোমার বাবা ব'লে অত সহজে কাজ সেরে নিলেন, কি বল রমা?" রমা নিরুত্তর রহিল, নিতাই বলিতে লাগিল "ভদ্রলোক যে ভাল মানুষ, তাতে তাঁর কথা ঠেলিতে পারে, এমন লোক ত আমি বড় একটা

দেখিনে!" রমা এবারে কথা বলিল,—আসন্ন বৃষ্টির দিনে আকাশে যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে, মুখখানা তেমনি গম্ভীর করিয়া সে বলিল, "এনিয়ে বোঝা পড়া তখন বাবার সঙ্গে কর্‌লেই হত, আমাকে এমন করে খোঁটা দিয়ে লাভ কি ?" নিতাই গম্ভীর হইয়া প্রত্যুত্তরে কহিল "আমি বেশ জানি, জগতে উচিত কথার উচিত মূল্য কোনও দিনই নাই! সত্যটা বল্‌তে হবে, যতক্ষণ তা প্রিয়, অপ্রিয় হলে'ই ব্যস চেপে যাও, এ ব্যবস্থা মন্দ নয়।" রমা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল। মাঝে মাঝে এরূপ তাহাদের হইত। কয়দিন পরে সে জেদ ধরিল যে, একবার তাহাকে বাপের বাড়ী রাখিয়া আসা হউক। নিতাই অনেক ওজর আপত্তি তুলিল, কিন্তু সে সব স্রোতের মুখে তৃণতুল্য। কোন যুক্তিই টিকল না, কোন তর্কই খাটিলনা। রমার জেদই বজায় রহিল। নিতাই নিজে রাঁধিয়া খায়, আপীস করে, আর রাঁধুনী রাখিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। একদিন হয় রাঁধুনীর অভাবে সংসারে এমন একটি বিভ্রাট চিরদিনের জন্য ঘটিয়াছে, সে বিভ্রাট ঘটিবার আর আজ কোনও সম্ভাবনা নাই, রাঁধুনীরও সেই জন্য প্রয়োজন নাই।

রাখালের অবস্থা এদিকে দিন দিন সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যে ঘর-জামাই এ কথাটা বাড়ীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দাসী চাকরটা পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। একদিন কয়েক খানা দামী ল-বুক কিনিবার জন্য শাশুড়ীকে দিয়া শ্বশুরের কাছে টাকা চাহিলে, তিনি উত্তর করিলেন, পরীক্ষায় পাসই ত হোক্, পরে প্রাক্‌টিস সুরু কর্‌লে দেখে-শুনে যা দরকার হয় কি'নে দেওয়া যাবে। যদি পরীক্ষাযই ফেল্ হয় ত, মিছে মিছে টাকাগুল লোকসান। এইত সবে ল ক্লাসে এড্‌মিশন নিয়েছে।" রাখাল পাশের ঘরেই ছিল, সব শুনিতে পাইল, আর কথাটি না বলিয়া কলেজে চলিয়া গেল। সেদিন

রাত্রে শশিকলাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ শশি! তোমরা বোধ হয়, বাড়ী শুদ্ধো সকলেই আমাকে দয়ার চক্ষে দেখ?"

শশিকলা একথার কোন অর্থ না বুঝিয়া তাহার উজ্জ্বল চোখ দুইটি মেলিয়া চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল "কেন, একথার মানে কি?" রাখাল তখন একে একে সকল কথাই বলিল। কথাগুলি শুনিয়া শশিকলার চক্ষে জল আসিল। তাহার স্বামীকে যে এতটুকুও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, হোক্না সে যত বড় আত্মীয়, তাহাকে সে কখনও ক্ষমা করিবে না। সে বলিল, "টাকার দরকার ত আমাকে বল্লেন না কেন?"

"কেন তুমি কি করতে শশি?" "আমার কাছে বুঝি টাকা নেই তুমি মনে কর?" "থাক্লেও সে যে তোমার বাবার দেওয়া টাকা, তাতে আমার কি অধিকার?" হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে শশিকলা বলিল, "নানা কথ্খন না! কে বললে আমার বাবার দেওয়া টাকা। আমি বুঝি বিয়ের সময় কিছু পাইনি! গয়না বাদে আমাকে যে যা আশীর্ব্বাদী দিয়েছে, সেও ত অন্ততঃ হাজার টাকা।" রাখাল বলিল, "তা হয়না শশি! এতদিন তোমার বাবার খাচ্ছ যে! ও টাকায় তোমার বাবারই অধিকার।"

"বেশ কথা বল্লে যাহোক্। স্ত্রীধনে কারো অধিকার নেই।"

"তবে আমারও নাই শশি!" "নাই যদি থাকে ত তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমাকে দিচ্ছি।" "না! তা পারবনা। আজ আমার মনে যে আঘাত লেগেছে, তা তুমি বুঝ্বে না তুমি আমার মতন অবস্থায় কোনও দিন পড়নি, তাই এ কথা বল্চ।"

"আচ্ছা দান বলে মনে কর্‌চ কেন? আমার যা তা তোমার নয় কি? আজ নয় স্বীকার না কর্‌তে পার কিন্তু কালই যদি আমি মরিত, আইন

আদালত তোমাকে ঠকাবেনা। আমার বাবাই ব্যবস্থা করে দেবেন যে, তাঁর মেয়ের যা সম্পত্তি, তা তাঁর জামাইএর প্রাপ্য।"

একথায় আর রাখাল কথা বলিতে পারিল না। তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। বহু কষ্টে তাহা থামাইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে সে বলিল—"শশি! শশি! তুমি এ কি বল্‌চ! তুমি মানুষ না দেবতা! জন্ম জন্ম তপস্যা করে যদি স্ত্রীলাভ কর্‌তে হয় ত, সে তোমার মত স্ত্রী।" শশিকলা লজ্জায় বিছানার মধ্যে মুখ লুকাইল।

৮

রাখালের শ্যালকেরা রোজ বিকালে বারান্দায় বসিয়া গল্প-গুজব করিত, আর কোন্ প্রফেসর সেক্‌স্‌পীয়ার ভাল পড়ান, কেমিন্‌টন ভাল পড়ান, তাই লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিত। তাহারা দেখিত, একটি ভদ্রলোক, রুগ্ন-চেহারা, পরিধানে সামান্য বেশ-ভূষা, তাহাদের বাড়ীর দিকে ছল ছল চোখে চাহিতে চাহিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে; কোন কোন দিন বা দেখিত, লোকটা বরাবর তাহাদের সদর দরজার নিকট আসিয়া তেওয়ারী দরোয়ানের সহিত কি কথোপকথন করিতেছে। একদিন রাখাল সেখানে ছিল। তাহার বড় শ্যালক যতীন্ বলিল, "দেখেছ হে রাখাল বাবু! ঐ লোকটা রোজ যাবার সময় আমাদের বাড়ীর পানে তাকাতে তাকাতে যায়। কোন কোন দিন নীচের দরোয়ানদের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলে।" রাখাল লোকটাকে দেখিয়া মুখ নামাইল, কোন কথা বলিল না। যতীন্ বলিল, "কি হে রাখাল বাবু, কথা কইচ না যে! একেবারে চুপচাপ কেন? আমরা কি পাপ করলাম যে একেবারে আমাদের সঙ্গে কথা

অবধি বল্‌তে নেই ?" রাখাল সে কথার সংক্ষেপে কি একটু উত্তর দিয়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। যতীনের ছোট ভাই মহীন বলিল, "রাখাল বাবুর আজ কাল কি হয়েচে, যেন আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই বলেন না।" যতীন্ বলিল, "বুঝতে পারচ না এর মানে। বি-এটা একেবারে অনার নিয়ে পাস করে গেল কিনা, তাই আর আমাদের সঙ্গে তেমন মিশ্‌তে চায়না।" বাপ্‌রে কি অহঙ্কার! তবু ত বি-এল পাস্ করেন্ নি! দেখা যাক্ কি হয়।" রাখাল তাহার শ্যালকদিগকে বিলক্ষণ জানিত। তাহারা মনে মনে যে তাহাকে ঈর্ষা করিত, সে বিষয়ে তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। অনেক সময় সাক্ষাতে অসাক্ষাতে সে তাহাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছে।

আর নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিয়াছে। আজিও সে যখন যতীনের মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি শুনিতে পাইল, তখনও তাহার মর্ম্মে গুরুতর আঘাত লাগিল। তাহার কাকা যে রোজ রোজ তাহার শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখ দিয়া বাড়ী যান, একথা মুখ ফুটিয়া সে কেমন করিয়া বলিবে। নীচে দরোয়ানকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তাহার খুড়া নিতাই প্রায় প্রতিদিনই দরোয়ানের কাছে আসিয়া, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যান। রাখালের হৃদয় হর্ষে-বিষাদে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। কাকার হৃদয় যে কত উচ্চ, তাঁহার স্নেহ যে কত অগাধ, তাহা বুঝিতে তাহার একটুকুও বাকি রহিল না। একেই বলে নিঃস্বার্থ স্নেহ। ইহার পর প্রতিদিনই রাখাল সেখানে বসিয়া থাকিত, আর দেখিত, সন্ধ্যার ঈষৎ-অন্ধকারের মধ্যে একটি শীর্ণকায় লোক তাহাদের ফটকের সম্মুখ দিয়া, তাহাদের বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছে। ওই অতটুকু মাত্র ব্যবধান! ইচ্ছা করিলেই দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারে। কিন্তু সে শক্তি কোথায়! যে

শৃঙ্খলে সে বাঁধা পড়িয়াছে, সে যে দাসত্বেরও অধম! কি পাপ! একদিন রাখাল আর নিতাইকে দেখিতে পাইল না। ভাবিল, অন্যত্র কোথাও হয়ত কাজ আছে। কিন্তু উপরি উপরি চার পাঁচ দিনও যখন আর দেখিতে পাইল না, তখন তাহার মনে বিষম খটকা লাগিল। কাকার ত কোন অসুখ হয় নাই! পরদিন দুপুর বেলা সে আপীসমুখো রওনা হইল। আপীসে গিয়া শুনিল, কাকার বিষম ব্যারাম, জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তার বলিয়াছে, খারাপ হইতে পারে। বেলা ৩টার সময় নিতান্ত মলিন-মুখে রাখাল নিঃশব্দে শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ করিল। রাত্রে তাহার বিমর্ষভাব দেখিয়া শশিকলা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁগা কি হয়েছে তোমার? তোমাকে অমন দেখাচ্চে কেন?" স্ত্রীর কাছে রাখালের এতটুকুও অভিমান নাই। সে বলিল "দেখ শশি! কাকার আমার বড় ব্যারাম। আজ আপীসে গিয়ে খোঁজ করে এয়েচি এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া কঠিন।"

শশিকলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। "হ্যাঁ বল কি! কি হবে তা'হলে?"

রাখাল। কি আর হবে, আমাকে যেতেই হবে।

শশিকলা। কবে?

রাখাল। আজই, এখনি।

শশিকলা। কখন ফির্‌বে?

রাখাল। তা বল্‌তে পারিনে।

শশিকলা। সে কি? এঁদের না বলে?

রাখাল। তা হোক্‌, এঁরা জান্‌লে কি যেতে দেবেন?

শশিকলা। তবে আমাকেও নিয়ে চল।

রাখাল। চল।

তখনই তাহারা নীচে নামিয়া আসিল। আষাঢ়ের রাত্রি। অবিশ্রান্ত

বৃষ্টি পড়িতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া কড় কড় শব্দে আকাশের বুকখানাকে চিরিয়া বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। সমস্ত বাড়ীখানি সুষুপ্ত। দেউড়ীর দরোয়ানের নাসিকাধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। এমন সময় তাহারা ফটকের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। কৈ! একখানা গাড়ীও ত রাস্তায় নাই। বাহিরেও ত দাঁড়ান যায় ন', যে দুর্য্যোগ। উদ্বেগে আশঙ্কায় দুই জনের বুক কেবল দুর দুর করিতে লাগিল। হঠাৎ একখানা গাড়ী দেখা গেল। যাক্ ভগবান্ বাঁচিয়েছেন! উঠে পড় উঠে পড়। তাড়াতাড়ি করিয়া রাখাল শশিকলার হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

"চালাও চালাও জোরসে চালাও! সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট!" বৃষ্টির মধ্য দিয়া তীরবেগে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

রমা বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবার পর নিতাইএর আপীসের খাটুনীর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের খাটুনী এত দুর বাড়িয়া পড়িল যে, শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইতে লাগিল। এক বিন্দুও যত্ন নাই, অযত্নে অবহেলায় শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন ঠাণ্ডা লাগিয়া, তাহার জ্বর হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাশি। সংবাদ পাইয়া রমা আসিল। একা স্ত্রীলোক, বহু কষ্টে স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারই বা কতটুকু শক্তি।

দুইজন ডাক্তার অনবরত দেখিতেছি! আজও বিকালে তাহারা আসিয়াছিল। রাখালের গাড়ী আসিয়া যখন দরজায় লাগিল, তখন রাত প্রায় এগারটা। দরজায় ঘা দিতেই একটী স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়: দিয়া বিস্মিতনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত রাখাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা কেমন আছেন বলত ?"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "বড্ড খারাপ, আমি আজকে এয়েচি। সন্ধ্যে

অবধি এখানে বসে আছি, কত লোক আসচে যাচ্ছে, তাই দোর আগ্‌লে থাক্‌তে হয়েচে।”

কতক ভয়ে, কতক সঙ্কোচে, পা টিপিয়া টিপিয়া, রাখাল যখন শশিকলাকে লইয়া উপরে গিয়া উঠিল, তখন রমা স্বামীর শিয়রের কাছে বসিয়া নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। আগে আগে রাখাল, পিছনে পিছনে শশিকলা, দুইজনে নিঃশব্দে গিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই ক্ষীণ কণ্ঠে নিতাই বলিল, “ও কে এসেচে দেখ ত!” রমা মুখ তুলিয়া দেখিল রাখাল, সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী একটী স্ত্রীলোক। “কি দেখতে আজ এসেচ রাখাল” বলিয়া রমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরে উঠিয়া শশিকলার হাত ধরিয়া বলিল, “ভিতরে চল বৌমা।” রাখালের চলিবার শক্তি ছিলনা। পা দুইখানি যেন কে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। দুই চক্ষু দিয়া কেবল অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে। বহু কষ্টে খুড়ার শয্যার পাশে গিয়া বসিয়া সে বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। “কাকা! কাকা! আমি যে এসেচি!” নিতাইএর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। জড়িতকণ্ঠে সে বলিল, “বাবা সত্যিই এসেচিস। না বিশ্বাস হচ্ছে না! তুই যে এখন পরাধীন।” পরে শশিকলার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, “মা-লক্ষ্মি! আপনার ঘরে যখন আপনিই এসেছ, তখন অচলা হয়ে থাক। আমার অদৃষ্টে নাই, তাই তোমাদের নিয়ে দু’টি দিন সুখ ভোগ কর্‌তে পার্‌লেম না।”

রাখাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, “কাকা আমিই আপনাকে মেরে ফেল্‌লুম! চক্ষের উপর দেখ্‌লুম, আপনি তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন! কোনই প্রতীকার করলুমনা! কাকা, পিতৃ-মাতৃঘাতীর পাপের কি মার্জ্জনা আছে?”

নিতাই বলিতে লাগিল, “কত করে তোকে মানুষ করেচি রাখাল,

সেই তুই পর হয়ে গেলি, বুকে বড়ই ব্যথা পেয়েছিলুম। বাপের স্নেহ, মার স্নেহ, এই দু'টোর মূলে আঘাত করে, তুই যে দিন চলে গেলি, সে যে কি দিন! সেদিন জীবনে আর আস্‌বেনা। এ জন্মের মত শেষ হয়ে গেছে! আজ যখন দেখতে পাচ্চি যে, তুই আবার ফিরে এসেচিস, তখন আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা হচ্চে। কিন্তু সে যে অসম্ভব! সবই হোল কিন্তু বড় বিলম্বে। তুই বিনে নন্দর আর কে আছে?" বলিয়া ক্ষীণ ডান হাতখানা তুলিয়া নিতাই নিদ্রিত শিশু পুত্রকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল। রাখাল ছুটিয়া গিয়া ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। গভীর-পুলকে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল! জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে মিলনের এ কি অপূর্ব্ব অভিনয়! একটি দিনের একটু ত্রুটি যে মহানর্থের সূত্রপাত করিতেছিল, আজ এক মুহূর্ত্তের মিলনে তাহা রূপান্তরিত হইয়া সার্থক সুন্দর পুণ্যময় মঙ্গল রূপে দেখ দিল। নিতাই আবার বলিতে লাগিল, "গুরুজনের কাছে উঁচু গলা করে বলেছিলুম, রাখাল রইল, বংশে বাতি জ্বল্‌বে, আমার আবার ভাবনা কি? পরে একদিনের একটী মুহূর্ত্তে কি করে ফেল্‌লুম, ভগবান্ জানেন, ফলে তোকে হারালুম! দাদা স্বর্গ থেকে দেখচেন, আর মনে মনে আমাকে অভিসম্পাত কচ্চেন! আজ তোর পুণ্যে আমার আজন্ম সঞ্চিত পাপরাশি ধুয়ে মুছে ফেলে যদি পবিত্র হতে পারি, তবেই সেখানে যেতে পারবো। একবার আমার কাছে আয়! ও কে? নন্দ? ওকে আর আমার কাছে আনিসনে! ...ওর দিকে তাকাতেই যে বুকখানা ফেটে যায়রে রাখাল!"

রাখালের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল যে তাহার কাকার জীবন-প্রদীপটী চিরদিন ধরিয়া কত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও প্রজ্বলিত থাকিয়া, আজ তৈলাভাবে নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে।

দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে, কিন্তু সেটীকে প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্য সে এতটুকুও চেষ্টা করে নাই। এ যে কি পাপ তাহা আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল।

বাহিরে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া দেবতার শাসন-বাণীর মত বজ্র-গর্জ্জিয়া উঠিল।

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৭	অস্তিনওয়ালা	আস্তিনওয়ালা
৫	২	সান্দ্র্য	সান্দ্র
১৯	১৫	দ্ব'মাস	ছ'মাস
২০	২	খাটে	খাটের
২১	১৭	বলিস্	বলচিস্
২৫	১৫	নিসর্গ-লক্ষ্মীর	নিসর্গ রাক্ষসীর
২৭	১৭	দেখেন	দেখ্‌তেন
২৮	৭	টিপে' টিপে'	পা টিপে টিপে
২৮	১৩	পূর্ব্বে	পূর্ব্বেই
২৯	৬	বুকের রক্ত	যারা বুকের রক্ত
২৯	২২	ওর	ওঁর
৩০	১৭	"	"
৩০	১৯	যেলা	ফেলাও
৩২	২২	কাছে	কাছেই
৩৪	১০	জীবতে	জীবতি
৩৭	১৮	করতে চান	করবেন
৩৮	১৭	দিয়ে না বস্‌তেন	দিয়ে বস্‌তেন
৩৯	৩	মেলো	খেলো
৪০	৮	তারা	তাঁরা
৪৪	২৪	আমার	আমার আছে
৫২	১৮	কনেস্টবল	কনস্টেবল
৫৭	৩	আমার	আমাকে
৬০	১৭	সাহেবকেও বড়	সাহেবকেও কেউ বড়
৬১	৬	সে	সেও
৬১	১৭	কফ্রীর	কাফ্রীরও
৬৮	১০	না	মা
৭৭	১৬	শুদ্ধ	সহজ
৭৮	১	উদ্দামে	উদ্দাম
৭৮	১০	সমস্ততান	সমস্তগুলি
৭৮	১১	সে নব	নব
৮৯	৬	জীবন ভার	জীবন ভ'রে
১০১	১৭	কষ্টার্থিক	কষ্টার্জ্জিত
১০৫	১৯	জনক	জনকে
১০৬	১৫	আমরা	আমার
১০৯	১১	উত্তর করিল	কমলা উত্তর করিল
১১৪	১	যে	সে
১১৯	১৪	সামলে করে	সামাল ক'রে
১২৬	৯	জ্ব'লে	জ্বে'লে
১৩৩	৪	পালাত	পড়েত
১৩৮	৬	হাওয়া	হাওয়ায়
১৬১	৪	থামাইয়া	সম্বরণ করিয়া
১৬১	৪	বলিল	বলিয়া উঠিল
১৬১	১০	কেমিনটন	কে মিলটন
১৬১	১৫	কথোপকথন করিতেছে	কথাবার্ত্তা বলিতেছে
১৬১	১৫	সেখানে	সেখানে উপস্থিত